হিন্দুধর্ম : বেদান্ত

স্বামী বিবেকানন্দ

(স্বামীজীর বাণীর সঙ্কলন)

হিন্দুধর্ম

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, চিকাগো ধর্ম-মহাসভার নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

হিন্দু, জরথুষ্ট্রীয় ও ইহুদী – এই তিনটি ধর্মই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল অবধি এই পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ধর্মগুলির প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি লুপ্ত না হইয়া এগুলি যে এখনও জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে মহতী শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু একদিকে যেমন ইহুদী-ধর্ম তৎপ্রসূত খ্রীষ্টধর্মকে আত্মসাৎ করিতে পারা তো দূরের কথা, নিজেই ঐ সর্বজয়ী ধর্ম দ্বারা স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছ, এবং অতি অল্পসংখ্যক পারসী মাত্র এখন মহান জরথুষ্টীয় ধর্মের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; অপরদিকে আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে, মনে হইয়াছে যেন বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া গেল; কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া সহস্রগুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রাসী বন্যারূপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীস্বরূপ বেদোক্ত ধর্মও প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে ঐ সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করিয়াছে।

বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত সবকিছুরই, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ – এগুলিরও স্থান হিন্দুধর্মে আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই সকল বহুধা বিভিন্ন ভাব কোন্ সাধারণ কেন্দ্রে সংহত হইয়াছে? কোন্ সাধারণ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া এই আপাতবিরোধী ভাবগুলি অবস্থান করিতেছে? আমি এখন এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আপ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু 'বেদ' শব্দদ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে।

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম 'ঋষি। আমরা তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বা পূর্ণ বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন।

এ-স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়মরূপে অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাহাদের আদি আছে। বেদ বলেন – সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ। আচ্ছা, যদি এমন এক সময়ের কল্পনা করা যায়, যখন কিছুই ছিল না, তবে এই সকল ব্যক্ত শক্তি তখন ছিল কোথায়? কেহ বলিবেন যে এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয় – ঈশ্বর কখনও সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়, কখনও সক্রিয় বা গতিশীল; অর্থাৎ তিনি বিকারশীল! বিকারশীল পদার্থমাত্রই মিশ্র পদার্থ এবং মিশ্র-পদার্থমাত্রই ধ্বংস-নামক পরিবর্তনের অধীন। তাহা হইলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হইবে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। সুতরাং এমন সময় কখনও ছিল না, যখন সৃষ্টি ছিল না; কাজেই সৃষ্টি অনাদি।

কোন উপমা দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় – সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুইটি অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখা। ঈশ্বর শক্তিস্বরূপ – নিত্যসক্রিয় বিধাতা; তাঁহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা হইতে একটির পর একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। হিন্দুবালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়া থাকেঃ 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।' – অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব- পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো এই সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।

আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি – 'আমি' 'আমি' 'আমি' , তাহা হইলে আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি – এই ভাবই মনে আসে। তবে কি আমি জড়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নই? বেদ বলিতেছেন: না, আমি এই দেহ নই। দেহ মরিবে, কিন্তু আমি মরিব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি, কিন্তু যখন এই দেহ মরিয়া যাইবে তখনও আমি বাঁচিয়া থাকিব এবং এই দেহের জন্মের পূর্বেও আমি ছিলাম। আত্মা শূন্য হইতে সৃষ্ট নয়, কারণ 'সৃষ্টি' শব্দের অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ; ভবিষ্যতে এগুলি নিশ্চয়ই আবার বিচ্ছিন্ন হইবে। অতএব আত্মা যদি সৃষ্ট পদার্থ হন, তাহা হইলে তিনি মরণশীলও বটে। সুতরাং আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নন।

কেহ জন্মিয়া অবধি সুখভোগ করিতেছে – শরীর সুস্থ ও সুন্দর, মন উৎসাহপূর্ণ, কিছুরই অভাব নাই; আবার কেহ জন্মিয়া অবধি দুঃখভোগ করিতেছে – কাহারও হস্ত- পদ নাই, কেহ বা জড়বুদ্ধি এবং অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছে। যখন সকলেই এক ন্যায়পরায়ণ ও করুণামায় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, তখন কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হইল কেন? ভগবান কেন এত পক্ষপাতী? যদি বলেন যে, যাহারা এজন্মে দুঃখভোগ করিতেছে, পরজন্মে তাহারা সুখী হইবে, তাহাতে অবস্থার কিছু উন্নতি হইল না। দয়াময় ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের রাজ্যে একজনও কেন দুঃখভোগ করিবে? দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে এভাবে দেখিলে এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর সৃষ্টির অন্তর্গত অসঙ্গতির কোন কারণ প্রদর্শন করার চেষ্টাও লক্ষিত হয় না; পরন্তু এক সর্বশক্তিমান্ স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিষ্ঠুর আদেশই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। স্পষ্টতই ইহা অবৈজ্ঞানিক। অতএব স্বীকার করিতে হইবে সুখী বা দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্বে নিশ্চয় বহুবিধ কারণ ছিল, যাহার ফলে জন্মের পর মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়; তাহার নিজের পূর্বজন্মের কর্মসমূহই সেই- সব কারণ।

দেহ- মনের প্রবণতা মাতাপিতার দেহ- মনের প্রবণতা হইতেই উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ হয় না কি? দেখা যাইতেছে যে, দুইটি সত্ত্বা সমান্তরাল রেখায় বর্তমান – একটি মন, অপরটি স্থূল পদার্থ। যদি জড় ও জড়ের বিকার দ্বারাই আমাদের অন্তর্নিহিত সকল ভাব যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তবে আর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। কিন্ত জড় হইতে চিন্তা উদ্ভূত হইয়াছে – ইহা প্রমাণ করা যায় না, এবং যদি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে একত্ববাদ অপরিহার্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক একাত্ববাদ নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত এবং জড়বাদী একাত্ববাদ অপেক্ষা ইহা কম বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ দুইটির কোনটিরই প্রয়োজন নাই।

আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, শরীরমাত্রেই উত্তরাধিকারসূত্রে কতকগুলি প্রবণতা লাভ করে, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক। এই দৈহিক প্রবণতার মাধ্যমেই মনের বিশেষ প্রবণতা ব্যক্ত হয়। মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম। বিশেষ কোন প্রবণতাসম্পন্ন জীব সদৃশবস্তুর প্রতি আকর্ষণের নিয়মানুসারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করিবে, যাহা তাহার ঐ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান- সম্মত, কারণ বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করিতে চায়, অভ্যাস আবার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, নবজাত প্রাণীর স্বভাবও তাহার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত কর্মের ফল; এবং যেহেতু তাহার পক্ষে বর্তমান জীবনে ঐগুলি লাভ করা অসম্ভব, অতএব অবশ্যই পূর্ব জীবন হইতেই ঐগুলি আসিয়াছে।

আর একটি প্রশ্নের ইঙ্গিত আছে। স্বীকার করা গেল পূর্বজন্ম আছে, কিন্তু পূর্ব জীবনের বিষয় আমাদের মনে থাকে না কেন? ইহা সহজেই বুঝানো যাইতে পারে। আমি এখন ইংরাজীতে কথা বলিতেছি, ইহা আমার মাতৃভাষা নয়। বাস্তবিক এখন আমার চেতন-মনে মাতৃভাষার একটি অক্ষরও নাই। কিন্তু যদি আমি মনে করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে উহা এখনই প্রবল বেগে মনে উঠিবে। এই ব্যাপারে বুঝা যাইতেছে, মনঃসমুদ্রের উপরিভাগেই চেতন-ভাব অনুভূত হয় এবং আমাদের পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা সেই সমুদ্রের গভীরদেশে সঞ্চিত থাকে। চেষ্টা ও সাধনা করুন, ঐগুলি সব উপরে উঠিয়া আসিবে, এমন কি পূর্বজন্ম সম্বন্ধেও আপনি জানিতে পারিবেন।

পূর্বজন্ম সম্বন্ধে ইহাই সাক্ষাৎ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ। কার্যক্ষেত্রে সত্যতা নির্ণীত হইলেই কোন মতবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়, এবং ঋষিগণ সমগ্র জগতে সদর্পে ঘোষণা করিতেছেন: স্মৃতিসাগরের গভীরতম প্রদেশ কিরূপে অলোড়িত করিতে হয়, সেই রহস্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। সাধনা করুন, আপনারাও পূর্বজন্মের সকল কথা মনে করিতে পারিবেন।

অতএব দেখা গেল, হিন্দু নিজেকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে। ‘সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না।’[১] হিন্দু বিশ্বাস করে: সেই আত্মা এমন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র দেহমধ্যে অবস্থিত, এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। আর আত্মা জড়নিয়মের বশীভূত নন, আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। কিন্তু কোন কারণবশতঃ জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন ও নিজেকে জড় মনে করিতেছেন।

পরবর্তী প্রশ্ন: কেন এই শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত আত্মা জড়ের দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ? পূর্ণ হইয়াও কেন তিনি নিজেকে অপূর্ণের ন্যায় মনে করিতেছেন? শুনিয়াছি, কেহ কেহ মনে করেন – এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে পারিবেন না বলিয়া হিন্দুগণ উহা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করেন। কোন কোন পণ্ডিত আত্মা ও জীব – এই দুয়ের মধ্যে কতকগুলি পূর্ণকল্প সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চান এবং শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে বহুবিধ সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ব্যবহার করেন। কিন্তু সংজ্ঞা দিলেই ব্যাখ্যা করা হয় না। প্রশ্ন যেমন তেমনি রহিল। যিনি পূর্ণ, তিনি কেমন করিয়া পূর্ণকল্প হইতে পারেন? যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, কেমন করিয়া তাঁহার সেই স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হয়? হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সরল ও সত্যবাদী। তাঁহারা মিথ্যা তর্কযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা সাহসের সহিত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং উত্তরে বলেন, ‘জানি না, কেমন করিয়া পূর্ণ আত্মা নিজেকে অপূর্ণ এবং জড়ের সহিত যুক্ত ও জড়ের নিয়মাধীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্যাপারটি তো অনুভূত সত্য। প্রত্যেকেই তো নিজেকে দেহ বলিয়া মনে করে।’ কেন এরূপ হইল, কেনই বা আত্মা এই দেহে রহিয়াছেন, এ তত্ত্ব তাঁহারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন না। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা – এরূপ বলিলে কিছুই ব্যাখ্যা করা হইল না। হিন্দুরা যে বলেন, ‘আমরা জানি না’, তাহা অপেক্ষা এই উত্তর আর বেশী কিছু নয়।

বেশ, তাহা হইলে বুঝা গেল যে, মানুষের আত্মা অনাদি অমর পূর্ণ ও অনন্ত এবং কেন্দ্র-পরিবর্তন বা দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। বর্তমান অবস্থা পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা, এবং ভবিষ্যৎ বর্তমান কর্ম দ্বারা নিরূপিত হয়। আত্মা জন্ম হইতে জন্মের পথে – মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে কখন বিকশিত হইয়া, কখন সঙ্কুচিত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠে: প্রচণ্ড বায়ুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষে উঠিতেছে, পরক্ষণেই মুখব্যাদানকারী তরঙ্গ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মাও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবর্তী হইয়া ক্রমাগত একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িতেছে? আত্মা কি নিত্যপ্রবাহিত প্রচণ্ড গর্জনশীল অদম্য কার্যকারণ-স্রোতে দুর্বল অসহায় অবস্থায় ক্রমাগত ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছে? আত্মা কি একটি ক্ষুদ্র কীটের মতো কার্যকারণ চক্রের নিম্নে স্থাপিত? আর ঐ চক্র সম্মুখে যাহা পাইতেছে, তাহাই চূর্ণ

---

[১] গীতা ২।২৩

করিয়া ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছে – বিধবার অশ্রুর দিকে চাহিতেছে না, পিতামাতৃহীন বালকের ক্রন্দনও শুনিতেছে না?

ইহা ভাবিলে মন দমিয়া যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই এই। তবে কি কোন আশা নাই? পরিত্রাণের কি কোন পথ নাই? মানবের হতাশ হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে এইরূপ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণাময়ের সিংহাসন সমীপে উহা উপনীত হইল, সেখান হইতে আশা ও সান্ত্বনার বাণী নামিয়া আসিয়া এক বৈদিক ঋষির হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিল। বিশ্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষি তারস্বরে জগতে এই আনন্দ সমাচার ঘোষণা করিলেন, 'শোন, শোন অমৃতের পুত্রগণ, শোন দিব্যালোকের অধিবাসিগণ, আমি সেই পুরাতন মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। আদত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে; তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নাই।'[২]

'অমৃতের পুত্র' – কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি আপনাদের সম্বোধন করিতে চাই। আপনারা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ আপনাদিগকে পাপী বলিতে চান না। আপনারা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী – পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্য-ভূমির দেবতা আপনারা! আপনারা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। উঠুন, আসুন, সিংহস্বরূপ হইয়া আপনারা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছেন, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দিন। আপনারা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা-চির-আনন্দময়। আপনারা জড় নহেন, আপনারা দেহ নহেন, জড় আপনাদের দাস, আপনারা জড়ের দাস নহেন।

এইরূপে বেদ ঘোষণা করিতেছেন – কতকগুলি ক্ষমাহীন নিয়মাবলীর ভয়াবহ সমাবেশ নয় বা কার্য-কারণের কারাবন্ধন আমাদের নিয়ন্তা নয়; কিন্তু এই-সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে এক বিরাট পুরুষ অনুস্যূত রহিয়াছেন, 'যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে।'[৩]

তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান্ – সকলের উপরেই তাঁহার করুণা। 'তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পরম প্রেমাস্পদ সখা বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মূল, তুমি আমাদের শক্তি দাও, তুমি বিশ্বজগতের ভার ধারণ করিয়া আছ; এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করিতে আমায় সাহায্য কর' – বৈদিক ঋষিগণ এইরূপ গানই গাহিয়াছেন। আমরা কিভাবে তাঁহাকে পূজা করিব? – প্রীতি ভালবাসা দিয়া। প্রেমাস্পদরূপে – ঐহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তররূপে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে।

শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে বেদ এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। এখন দেখা যাক্ হিন্দুগণ পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া যাঁহাকে বিশ্বাস করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই প্রেমতত্ত্ব পরিপূর্ণ করিযা প্রচার করিয়াছেন।

তিনি শিক্ষা দিয়াছেন: মানুষ পদ্মপত্রের মতো সংসারে বাস করিবে। পদ্মপত্র জলে থাকে, কিন্তু তাহাতে জল লাগে না; মানুষ তেমনি এই সংসারে থাকিবে, ঈশ্বরে হৃদয সমর্পণ করিয়া হাতে কাজ করিবে।

ইহলোকে ও পরলোকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালোবাসা ভাল; কিন্তু ভালোবাসার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসা আরও ভাল। তাইতো এই প্রার্থনা: প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিদ্যা চাই না। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি শত বিপদের মধ্য দিয়া যাইব; কিন্তু আমার শুধু এই ইচ্ছা পূর্ণ করিও, কোন পুরস্কারের আশায় নয়, নিঃস্বার্থভাবে শুধু ভালবাসার জন্যই যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি।

---

[২] শেতাশ্বঃ উপঃ ২।৫

[৩] কঠ উপ, ২।৩।৩

শ্রীকৃষ্ণের এক শিষ্য তৎকালীন ভারতের সম্রাট শত্রু কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাণীর সহিত হিমালয়ের অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে রাণী একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ব্যক্তি, আপনাকে কেন এত কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে?' যুধিষ্ঠির উত্তর দেন, 'প্রিয়ে, দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আহা! কেমন সুন্দর ও মহান্! আমি হিমালয় বড় ভালবাসি। পর্বত আমাকে কিছুই দেয় না, তথাপি সুন্দর ও মহান বস্তুকে ভালবাসাই আমার স্বভাব, তাই আমি হিমালয়কে ভালবাসি। ঈশ্বরকেও আমি ঠিক এই জন্য ভালবাসি। তিনি নিখিল সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের মূল, তিনিই ভালবাসার একমাত্র পাত্র। তাঁহাকে ভালবাসা আমার স্বভাব, তাই আমি ভালবাসি। আমি কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করি না, আমি তাঁহার নিকট কিছুই চাই না, তাঁহার যেখানে ইচ্ছা আমাকে তিনি সেখানে রাখুন, সর্ব অবস্থাতেই আমি তাঁহাকে ভালবাসিব। আমি ভালবাসার জন্য তাঁহাকে ভালবাসি। আমি ভালবাসার ব্যবসা করি না।'

বেদ শিক্ষা দেন: আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, কেবল জড় পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়া আছেন; এই বন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণ হইলেই আত্মা পূর্ণত্ব উপলব্ধি করেন। অতএব এই পরিত্রাণের অবস্থা বুঝাইবার জন্য ঋষিদের ব্যবহৃত শব্দ 'মুক্তি' ! মুক্তি, মুক্তি – অপূর্ণতা হইতে মুক্তি – মৃত্যু ও দুঃখ হইতে মুক্তি।

ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে পারে এবং পবিত্র- হৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার কৃপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁহার কৃপালাভের উপায়। কিভাবে তাঁহার করুণা কাজ করে? শুদ্ধ বা পবিত্র হৃদয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। নির্মল বিশুদ্ধ মানুষ ইহজীবনেই ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেন। 'তখনই- কেবল তখনই হৃদয়ের সকল কুটিলতা সরল হইয়া যায়, সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়।' মানুষ তখন আর ভয়ঙ্কর কার্যকারণ নিয়মের ক্রীড়াকন্দুক নয়। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্মস্থল, ইহাই হিন্দুধর্মের প্রাণস্বরূপ। হিন্দু কেবল মতবাদ ও শাস্ত্রবিচার লইয়া থাকিতে চায় না; সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির পারে যদি অতীন্দ্রিয় সত্তা কিছু থাকে, হিন্দু সাক্ষাৎভাবে তাহার সম্মুখীন হইতে চায়। যদি তাহার মধ্যে আত্মা বলিয়া কিছু থাকে, যাহা আদৌ জড় নয়, – যদি করুণাময় বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা থাকেন, হিন্দু সোজা তাঁহার কাছে যাইবে, অবশ্যই তাঁহাকে দর্শন করিবে। তবেই তাহার সকল সন্দেহ দূর হইবে। অতএব আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়া জ্ঞানী হিন্দু বলেন, 'আমি আত্মাকে দর্শন করিয়াছি, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি।' সিদ্ধি বা পূর্ণত্বের ইহাই একমাত্র নিদর্শন। কোন মতবাদ অথবা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষানুভূতিই উহার মূলমন্ত্র, শুধু বিশ্বাস করা নয়, আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই – উহা জীবনে পরিণত করাই ধর্ম।

এখন দেখা যাইতেছে, ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা – দিব্যভাবে ভাবান্বিত হইয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া সেই 'স্বর্গস্থ পিতা` র মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম।

পূর্ণ হইলে মানুষের কি অবস্থা হয়? তিনি অনন্ত আনন্দময় জীবন যাপন করেন। আনন্দের একমাত্র উৎস ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তিনি পরমানন্দের অধিকারী হন, এবং ঈশ্বরের সহিত সেই আনন্দ উপভোগ করেন – সকল হিন্দু এ- বিষয়ে একমত। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ইহা সাধারণ ধর্ম।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, পূর্ণতাই পরম তত্ত্ব, এবং সেই পরম কখনও দুই বা তিন হইতে পারে না, উহাতে কোন গুণ বা ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব যখন আত্মা এই পূর্ণ ও পরম অবস্থায় উপনীত হন , তখন ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাইবেন এবং একমাত্র ব্রহ্মকেই নিত্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবেন। তিনিই আত্মার স্বরূপ- নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, নিরপেক্ষ আনন্দ – সৎ- চিৎ- আনন্দ- স্বরূপ। আমরা প্রায়ই পড়িয়া থাকি, আত্মার এই অবস্থা – ব্যক্তিত্বের লয় – কাঠ পাথরের মতো জড়াবস্থা; ইহাতে লেখকদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়, কারণ যিনি কখনও আঘাতের বেদনা বোধ করেন নাই, তিনি অপরের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া পরিহাস করেন ।

আমি বলিতেছি, এই অবস্থা ঐরূপ কিছু নয়। এই ক্ষুদ্র দেহের চেতনা উপভোগ যদি সুখের হয়, তবে দুইটি দেহের চেতনা উপভোগ আরও বেশী সুখের হইবে। এইরূপে দেহসংখ্যা যতই বাড়িবে, আমার সুখও ততই বাড়িবে। এইরূপে যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ হইবে, তখনই আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠায় – লক্ষ্যে উপনীত হইব।

অতএব এই অনন্ত বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে গেলে এই দুঃখপূর্ণ ক্ষুদ্র দেহাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। যখন আমি প্রাণস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন আনন্দস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই ভ্রমের নিবৃত্তি। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের প্রমাণে জানিয়াছি – দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার শরীর এই নিরবচ্ছিন্ন জড়সমুদ্রে অবিরাম পরিবর্তিত হইতেছে; সুতরাং আমার চৈতন্যাংশ সম্বন্ধে এই অদ্বৈত (একত্ব)-জ্ঞানেই কেবল যক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়; এবং যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখন উহার অগ্রগতি থামিয়া যাইবেই, কারণ ঐ বিজ্ঞান তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে। যথা – রসায়নশাস্ত্র যদি এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে, যাহা হইতে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে উহা চরম উন্নতি লাভ করিল। পদার্থবিদ্যা যদি এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিতে পারে, অন্যান্য শক্তি যাহার রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞানের কার্য শেষ হইল। ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, যখন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা – অন্যান্য অত্মা যাঁহার ভ্রমাত্মক প্রকাশ। এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই সর্বপ্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।

সকল বিজ্ঞানকেই অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ 'সৃষ্টি' না বলিয়া 'বিকাশ' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।

এখন দর্শনের উচ্চ শিখর হইতে অবরোহণ করিয়া অজ্ঞলোকদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করি। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ভারতবর্ষে বহু-ঈশ্বরবাদ নাই। প্রতি দেবালয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহা হইলে শুনিতে পাইবে, পূজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ, এমন কি সর্বব্যাপিত্ব পর্যন্ত আরোপ করিতেছে। ইহা বহু-ঈশ্বরবাদ নয়, বা ইহাকে কোন দেব-বিশেষের প্রাধান্যবাদ বলিলেও প্রকৃত ব্যাপার ব্যাখ্যাত হইবে না। গোলাপকে যে-কোন অন্য নামই দাও না কেন, তাহার সুগন্ধ সমানই থাকিবে। সংজ্ঞা বা নাম দিলেই ব্যাখ্যা করা হয় না।

মনে পড়ে বাল্যকালে একদা এক খ্রীষ্টান পাদ্রীকে ভারতে এক ভিড়ের মধ্যে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম। নানাবিধ মধুর কথা বলিতে বলিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি যদি তোমাদের বিগ্রহ-পুতুলকে এই লাঠি দ্বারা আঘাত করি, তবে উহা আমার কি করিতে পারে?' জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল, 'আমি যদি তোমার ভগবানকে গালাগালি দিই, তিনিই বা আমার কি করিতে পারেন?' পাদ্রী উত্তর দিলেন, 'মৃত্যুর পর তোমার শাস্তি হইবে।' সেই ব্যক্তিও বলিল, 'তুমি মরিলে পর আমার দেবতাও তোমাকে শাস্তি দিবেন।'

ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখি যে যাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন সব মানুষ আছেন, যাঁহাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়: পাপ হইতে কি কখনও পবিত্রতা জন্মিতে পারে?

কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ। খ্রীষ্টানরা কেন গির্জায় যান? ক্রুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন আকাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মূর্তি রহিয়াছে কেন? প্রোটেষ্টান্টদের মনে প্রার্থনাকালে এত ভাবময় রূপের আর্বিভাব হয় কেন ? হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবনধারণ করা যেমন অসম্ভব, চিন্তাকালে মনোময় রূপ বিশেষের সাহায্য না লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব। ভাবানুষঙ্গ- নিয়মানূসারে জড়মূর্তি দেখিলে মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাববিশেষের উদ্দীপন হইলে তদনুরূপ মূর্তিবিশেষও মনে উদিত হয়। এইজন্য হিন্দু উপাসনার সময়ে বাহ্য প্রতীক ব্যবহার করে। সে বলিবে, তাহার উপাস্য দেবতায় মন স্থির করিতে প্রতীক সাহায্য করে। সে আপনাদেরই মতো জানে, প্রতিমা ঈশ্বর নয়, সর্বব্যাপী নয়। আচ্ছা বলুন তো, 'সর্বব্যাপী' বলিতে অধিকাংশ মানুষ – প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর মানুষ কি বুঝিয়া থাকে? ইহা একটি শব্দমাত্র – একটি প্রতীক। ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে? তা যদি থাকে, তবে 'সর্বব্যাপী' শব্দটি আবৃত্তি করিলে আমাদের মনে বড়জোর বিস্তৃত আকাশ অথবা মহাশূন্যের কথাই উদিত হয়, এই পর্যন্ত।

দেখা যাইতেছে – যেভাবেই হউক – মানুষের মনের গঠনানুসারে অনন্তের ধারণা অনন্ত নীলাকাশ বা সমুদ্রের প্রতিচ্ছবির সহিত জড়িত; সেজন্য আমরা স্বভাবতই পবিত্রতার ধারণা গির্জা, মসজিদ বা ক্রুশের সহিত যুক্ত করিয়া থাকি। হিন্দুরা পবিত্রতা, সত্য, সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তবে প্রভেদ এই যে, কেহ কেহ সমগ্র জীবন স্বীয় ধর্মসম্প্রদায়ের গণ্ডিবদ্ধ ভাবের মধ্যেই নিষ্ঠাপূর্বক কাটাইয়া দেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করেন না, তাঁহাদের নিকট কয়েকটি মতে সম্মতি দেওয়া এবং লোকের উপকার করা ভিন্ন ধর্ম আর কিছুই নয়; কিন্তু হিন্দুর সমগ্র ধর্মভাব অপরোক্ষানুভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, দেববিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র- সবই মানুষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়ক মাত্র, তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন: 'বাহ্যপূজা- মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থা; কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর; কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা।'[৪] যে একাগ্র সাধক জানু পাতিয়া দেববিগ্রহের সম্মুখে পূজা করেন, লক্ষ্য করুন – তিনি আপনাকে কি বলেন, 'সূর্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; চন্দ্র তারা এবং এই বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? ইহারা সকলেই তাঁহার আলোকে প্রকাশিত।'[৫] তিনি কাহারও দেববিগ্রহকে গালি দেন না বা প্রতিমাপূজাকে পাপ বলেন না। তিনি ইহাকে জীবনের এক প্রয়োজনীয় অবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন। শিশুর মধ্যেই পূর্ণ মানবের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। বৃদ্ধের পক্ষে শৈশব ও যৌবনকে পাপ বলা কি উচিত হইবে?

হিন্দুধর্মে বিগ্রহ- পূজা যে সকলের অবশ্য কর্তব্য, তাহা নয়। কিন্তু কেহ যদি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের দিব্য ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে কি উহাকে পাপ বলা সঙ্গত? সাধক যখন ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তখনও তাঁহার পক্ষে উহাকে ভুল বলা সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য হইতে সত্যে – নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে। হিন্দুর নিকট নিম্নতম জড়োপাসনা হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার – উপলব্ধি করিবার

---

[৪] মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।১২

[৫] কঠ, উপ, ২।২।১৫; শ্বেঃ, ৬।১৪; মু, ২।২।১০

জন্য মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা। জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের সাধন- প্রচেষ্টা নিরূপিত হয়। প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা। প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল- পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে সেই মহান সূর্যে উপনীত হয়।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা একমাপের জামা রাখিয়া দেয়; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ঐ এক মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে, তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে। হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন: আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব; এবং প্রতিমা ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ। এই প্রকার সাহায্য যে সকলের পক্ষেই আবশ্যক তাহা নয়, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই প্রকার সাহায্য আবশ্যক। যাহাদের পক্ষে ইহা আবশ্যক নয়, তাহাদের বলিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই যে, ইহা অন্যায়।

আর একটি বিষয় বলা আমার অবশ্য কর্তব্য। ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা বলিলে ভয়াবহ একটা কিছু বুঝায় না। ইহা দুষ্কর্মের প্রসূতি নয়, বরং ইহা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণা করিবার চেষ্টাস্বরূপ। হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে; কিন্তু লক্ষ্য করিবেন, তাহারা সর্বাবস্থায় নিজেদের দেহপীড়নই করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না। কোন ধর্মোন্মাদ হিন্দু – চিতায় স্বীয় দেহ দগ্ধ করিলেও ধর্মগত অপরাধের প্রতিবিধান করিবার জন্য কখনও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে না; ইহাকে যদি তাহার দুর্বলতা বলেন, সে দোষ তাহার ধর্মের নয়, যেমন ডাইনী পোড়ানোর দোষ খ্রীষ্টধর্মের উপর দেওয়া যায় না।

অতএব হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কিছু নয়।

প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্য- স্বরূপ – দেবত্ব বিকশিত করে, এবং সেই এক চৈতন্য- স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা। তবে এত পরস্পরবিরোধী ভাব কেন? হিন্দু বলেন – আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই এরূপ পরস্পর- বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে।

একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের মধ্য দিয়া আসিতেছে। সকলের উপযোগী হইবে বলিয়া এই সামান্য বিভিন্নতা প্রয়োজন। কিন্তু সব কিছুরই অন্তস্তলে সেই এক সত্য বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভগবান বলিয়াছেন: সূত্র যেমন মণিগণের মধ্যে, আমিও সেইরূপ সকল ধর্মের মধ্যে অনুস্যূত। যাহা কিছু অতিশয় পবিত্র ও প্রভাবশালী, মানবজাতির উন্নতিকারক ও পাবনকারী, জানিবে – সেখানে আমি আছি।[৬] এই শিক্ষার ফল কি? আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে এরূপ ভাব কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, একমাত্র হিন্দুই মুক্তির অধিকারী, আর কেহ নয়। ব্যাস বলিতেছেন, ‘আমাদের জাতি ও ধর্মমতের সীমানার বাহিরেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই।’

আর একটি কথা। কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, সর্বতোভাবে ঈশ্বরপরায়ণ হিন্দুগণ কিরূপে অজ্ঞেয়বাদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের মত বিশ্বাস করিতে পারেন? বৌদ্ধ ও জৈনরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না বটে, কিন্তু সকল ধর্মের সেই মহান্ কেন্দ্রীয় তত্ত্ব – মানুষের ভিতর দেবত্ব বিকশিত করার দিকেই তাঁহাদের ধর্মের

---

[৬] তুলনীয় গীতা; ৭।৭, ১০।৪১

সকল শক্তি নিয়োজিত হয়। তাঁহারা ‘জগৎপিতা’-কে দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রকে (আদর্শ মানবকে) দেখিয়াছেন, এবং যে পুত্রকে দেখিয়াছে, সে পিতাকেও দেখিয়াছে।[৭]

ভ্রাতৃগণ, ইহাই হিন্দুদের ধর্মবিষয়ক ধারণাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হিন্দু তাহার সব পরিকল্পনা হয়তো কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কিন্তু যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হইবে, ঐ ধর্মকে তাহারই মতো অসীম হইতে হইবে; সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত খ্রীষ্টভক্ত, সাধু অসাধু – সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে; স্বীয় উদারতাবশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে, পশুতুল্য অতি হীন বর্বর মানুষ হইতে শুরু করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাশির জন্য যাঁহারা সমগ্র মানবজাতির ঊর্ধ্বে স্থান পাইয়াছেন , সমাজ যাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষ বলিতে সাহস না করিয়া সশ্রদ্ধ সভয় দৃষ্টিতে দেখেন – সেই-সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দিবে। সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না; উহাতে প্রত্যেক নরনানীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলদ্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।

এইরূপ ধর্ম উপস্থাপিত করুন, সকল জাতিই আপনার অনুবর্তী হইবে। অশোকের ধর্মসভা কেবল বৌদ্ধধর্মের জন্য হইয়াছিল। আকবরের ধর্মসভা ঐ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হইলেও উহা বৈঠকী আলোচনা মাত্র। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন – সমগ্র জগতে এ-কথা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার জন্যই সংরক্ষিত ছিল।

যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, পারসীকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের জিহোবা, খ্রীষ্টানদের ‘স্বর্গস্থ পিতা’, তিনি আপনাদের এই মহৎ ভাব কার্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন। পূর্ব গগনে নক্ষত্র উঠিয়াছিল – কখন উজ্জ্বল, কখন অস্পষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে উহা পশ্চিম গগনের দিকে চলিতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণ উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় পূর্বগগনে স্যানপোর[৮] সীমান্তে উহা উদিত হইতেছে।

স্বাধীনতার মাতৃভূমি কলম্বিয়া,[৯] তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ হস্ত রঞ্জিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণ-রূপ ধনশালী হইবার সহজ পন্থা আবিষ্কার কর নাই। সভ্যতার পুরোভাগে সমন্বয়ের পতাকা বহন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইবার ভার তাই তোমারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

---

[৭] Bible

[৮] ‘সাংপো’ ব্রহ্মপুত্রের তিব্বতী নাম।

[৯] কলম্বাস-কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া আমেরিকার আর একটি নাম ‘কলম্বিয়া’।

বেদান্ত

[লাহোরে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা, ১২ই নভেম্বর, ১৮৯৭]

আমরা দুইটি জগতে বাস করিয়া থাকি – বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ এই উভয় জগতেই প্রায় সমভাবে উন্নতি করিয়া আসিতেছে। প্রথমেই বর্হিজগতে গবেষণা আরম্ভ হয় এবং মানুষ প্রথমতঃ বহিঃপ্রকৃতি হইতেই সকল গভীর সমস্যার উত্তর পাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে প্রথমতঃ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় প্রকৃতি হইতে তাহার মহান ও সুন্দরের জন্য পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছে; নিজেকে এবং নিজের ভিতরের সমুদয় বস্তুকে স্থূলের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া সে যে সকল উত্তর পাইয়াছে, ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে যে-সকল অতি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সেই শিবসুন্দরকে যে আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে, তাহা অতি অপূর্ব। বহির্জগৎ হইতে মানুষ যথার্থই মহান ভাবসমূহ লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরে তাহার নিকট অন্য এক জগৎ উন্মুক্ত হইল, তাহা আরও মহত্তর, আরও সুন্দরতর, আরও অনন্তগুণে বিকাশশীল। বেদের কর্মাকাণ্ডভাগে আমরা ধর্মের অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ বিবৃত দেখিতে পাই, আমরা জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা বিধাতার সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্ময়কর তত্ত্বসমূহ দেখিতে পাই, আর এই ব্রহ্মাণ্ডকে যে ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অতিশয় প্রাণস্পর্শী। আপনাদের মধ্যে হয়তো অনেকেরই ঋগ্ বেদ-সংহিতার প্রলয়বর্ণনাত্মক সেই অপূর্ব মন্ত্রটির কথা স্মরণ আছে। বোধ হয় এরূপ মহদ্ভাব-দ্যোতক বর্ণনা করিতে এ পর্যন্ত কেহ চেষ্টা করে নাই। তথাপি উহা কেবল বহিঃপ্রকৃতির মহান ভাবের বর্ণনা – উহা স্থূলেরই বর্ণনা, উহাতে যেন এখনও কিছু জড়ভাব লাগিয়া রহিয়াছে। উহা কেবল জড়ের ভাষায়, সীমার ভাষায় অসীমের বর্ণনা; উহা জড় দেহেরই বিস্তারের বর্ণনা – মনের নহে; উহা দেশেরই অনন্তত্বের বর্ণনা, মনের নহে। এই কারণে বেদের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে দেখিতে পাই, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম প্রণালী ছিল – বহিঃপ্রকৃতি হইতে বিশ্বের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করা। জড়জগৎ হইতেই জীবনের সমুদয় গভীর সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা প্রথমে হইয়াছিল। 'যস্যৈতে হিমবন্তো মহিত্বা' – এই হিমালয় পর্বত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এ খুব উচ্চ ধারণা বটে, কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত হয় নাই। ভারতীয় মন ঐ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতবাসীর গবেষণা সম্পূর্ণরূপে বহির্জগৎ ছাড়িয়া ভিন্ন দিকে গেল, অন্তর্জগতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, জড় হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ 'চৈতন্যে' আসিলেন। এই প্রশ্ন চতুর্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিলঃ মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়? – 'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে'।[10] – কেহ বলে, মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে; কেহ বলে, থাকে না। হে যমরাজ, ইহার মধ্যে সত্য কি? এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতীয় মন বহির্জগৎ হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে সে সন্তুষ্ট হয় নাই, আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়াসী হইয়াছিল, নিজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; শেষে উত্তর আসিল।

বেদের এই ভাগের নাম উপনিষদ বা বেদান্ত বা আরণ্যক বা রহস্য। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম বাহ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখানে আমরা দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি জড়ের ভাষায় নহে, চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত – সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ তাহার উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর কোনরূপ স্থূলভাব নাই, আমরা যে-সকল বিষয় লইয়া সচরাচর ব্যস্ত থাকি, সেই-সকল বিষয়ের সহিত জোড়াতালি দিয়া সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা নাই। উপনিষদের মহামনা ঋষিগণ অত্যন্ত সাহসের সহিত – এখন আমরা এরূপ সাহসের

---

[1] কঠ উপ, ১।২০

ধারণাই করিতে পারি না – নির্ভয়ে কোনরূপ জোড়াতালি না দিয়া মানবজাতির নিকট মহত্তর সত্যসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন; এইরূপ উচ্চতম সত্য জগতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমি আপনাদের নিকট সেইগুলি বিবৃত করিতে চাই।

বেদের এই জ্ঞানকাণ্ড বিশাল সাগরের মতো। উহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে হইলেও অনেক জন্ম প্রয়োজন। এই উপনিষদ সম্বন্ধে রামানুজ ঠিকই বলিয়াছেন, বেদান্ত বেদের বা শ্রুতির শিরঃস্বরূপ, – আর সত্যই ইহা বর্তমান ভারতের বাইবেল- স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদের কর্মকাণ্ডকে হিন্দুরা খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা জানি, প্রকৃতপক্ষে শত শত যুগ ধরিয়া 'শ্রুতি' অর্থে উপনিষদ – কেবল উপনিষদই বুঝাইয়াছে। আমরা জানি, আমাদের বড় বড় দার্শনিকগণ – ব্যাস, পতঞ্জলি, গৌতম, এমন কি দর্শনশাস্ত্রের জনকস্বরূপ মহাপুরুষ কপিল পর্যন্ত – যখন তাঁহাদের মতের সমর্থক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তাঁহারা উপনিষদ হইতেই উহা পাইয়াছেন, অন্য কোথায় নহে; কারণ উপনিষদসমূহের মধ্যেই সনাতন সত্য অনন্তকালের জন্য নিহিত রহিয়াছে।

কতকগুলি সত্য আছে, যেগুলি কেবল বিশেষ দেশ- কাল- পাত্রে বিশেষ অবস্থায় সত্য। সেগুলি বিশেষ যুগের বিধান হিসাবে সত্য। আবার কতকগুলি সত্য আছে, সেগুলি মানবপ্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, সেগুলিও ততদিন থাকিবে। এই শেষোক্ত সত্যগুলি সর্বজনীন ও সার্বকালিক; আর যদিও আমাদের ভারতীয় সমাজে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমাদের আহার- বিহার পোশাক- পরিচ্ছদ উপাসনাপ্রণালী এ- সকলই যদিও অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু এই শ্রৌত সর্বজনীন সত্যসমূহ – বেদান্তের এই অপূর্ব তত্ত্বরাশি – স্বমহিমায় অচল অজেয় ও অবিনাশী হইয়া রহিয়াছে।

উপনিষদের যে- সকল তত্ত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, সেগুলির বীজ কিন্তু কর্মকাণ্ডেই পূর্ব হইতে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। জগৎ- তত্ত্ব, যাহা সকল সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে; এমন কি মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব – যাহা সকল ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর মূলভিত্তিস্বরূপ, তাহাও কর্মাকাণ্ডে বিবৃত ও জগতের সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব বেদান্তের আধ্যাত্মিক ভাগের বিষয় বলিবার পূর্বে আপনাদের সমক্ষে কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, আর বেদান্ত- শব্দটি কি অর্থে আমি ব্যাবহার করিতেছি, তাহা প্রথমেই আপনাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। দুঃখের বিষয়, আজকাল আমরা প্রায়ই একটি বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি – আমরা বেদান্ত- শব্দে কেবল অদ্বৈতবাদ বুঝিয়া থাকি। আপনাদের কিন্তু এইটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, বর্তমান ভারতবর্ষে সকল ধর্মমত অধ্যয়ন করিতে 'প্রস্থানত্রয়' সমভাবে উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ, দ্বিতীয়তঃ ব্যাসসূত্র। আমাদের দর্শন- শাস্ত্রসমূহের মধ্যে এই ব্যাসসূত্রই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহা পূর্ববর্তী অন্যান্য দর্শনসমূহের সমষ্টি ও চরম পরিণতিস্বরূপ। এই দর্শনগুলিও যে পরস্পর- বিরোধী তাহা নহে, উহাদের মধ্যে একটি যেন অপরটির ভিত্তিস্বরূপ, যেন সত্যানুসন্ধিৎসু মানবের নিকট সত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ব্যাসসূত্রে ঐগুলি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। আর এই উপনিষদ এবং বেদান্তের অপূর্ব সত্যসমূহের প্রণালীবদ্ধ বিন্যাসরূপ ব্যাসসূত্রের মাঝখানে বেদান্তের টীকাস্বরূপ ভগবানের মুখনিঃসৃত 'গীতা' বর্তমান।

এই কারণেই দ্বৈতবাদী, অদৈতবাদী, বৈষ্ণব – ভারতের যে- কোন সম্প্রদায়ই হউন না কেন, যাঁহারাই নিজদিগকে সনাতন- মতালম্বী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তাঁহারা সকলেই উপনিষদ, গীতা ও ব্যাসসূত্রকে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ধরিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, কি শঙ্করাচার্য, কি রামানুজ, কি মধ্বাচার্য, কি বল্লভাচার্য, কি শ্রীচৈতন্য – যিনিই নূতন সম্প্রদায়- গঠনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই তিনটি 'প্রস্থান' গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং এগুলির উপর একটি করিয়া নূতন ভাষ্য রচনা করিতে হইয়াছে। অতএব উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া যে- সকল বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাত্র একটি মতের উপর

'বেদান্ত'-শব্দটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। বেদান্ত-শব্দে প্রকৃতপক্ষে এই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতগুলিকেই বুঝায়। অদ্বৈতবাদীর যেমন 'বেদান্তী' বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার, রামানুজীরও সেইরূপ। আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই, আমরা প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু'-শব্দের দ্বারা বৈদান্তিকই বুঝিয়া থাকি।

আর এই বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, – এই তিনটি মত স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আবিষ্কারক নহেন, শঙ্করের আবির্ভাবের অনেকদিন পূর্ব হইতে উহা বর্তমান ছিল – শঙ্কর উহার একজন শেষ প্রতিনিধিমাত্র। রামানুজী মতও তাই – রামানুজের জন্মের অনেক পূর্ব হইতেই যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিদ্যমান ছিল, তাহা তাঁহাদের মতের ভাষ্য হইতেই আমরা জানি। অন্যান্য যে-সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় পাশাপাশি ভারতে বর্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। আর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই-সকল মত পরস্পরবিরোধী নহে। আমাদের ষড়্‌দর্শন যেমন মহান্ তত্ত্বসমূহের ক্রমবিকাশ-মাত্র, ইহা যেমন অতি মৃদুধ্বনিতে আরম্ভ করিয়া শেষে অদ্বৈতের বজ্রনির্ঘোষে পরিণত হইয়াছে, তেমনি পূর্বোক্ত তিনটি মতেও আমরা দেখিতে পাই, মানবমন উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে – অবশেষে সবগুলিই অদ্বৈতবাদের সেই বিস্ময়কর একত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। অতএব এই তিনটি পরস্পরবিরোধী নহে।

অপর দিকে আমি বলিতে বাধ্য, অনেকে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে, এগুলি পরস্পরবিরোধী। আমরা দেখিতে পাই, যে শ্লোক গুলিতে বিশেষভাবে অদ্বৈতবাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, অদ্বৈতবাদী সেইগুলিকে যথাযথ রাখিয়া দিতেছেন, কিন্তু যেখানে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ আছে, টানিয়া সেইগুলির অদ্বৈত অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বৈতবাদী আচার্যগণ দ্বৈত শ্লোকগুলির যথাযথ অর্থ করিয়া অদ্বৈত শ্লোকগুলি টানিয়া দ্বৈত অর্থ করিতেছেন। অবশ্য ইঁহারা মহাপুরুষ – আমাদের গুরুপদবাচ্য। তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'দোষা বাচ্যা গুরোরপি' – গুরুরও দোষ বলা উচিত। আমার মত এই যে, কেবল এই বিষয়েই তাঁহারা ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কোনরূপ ধর্মীয় অসাধুতার আশ্রয় লইয়া ধর্মব্যাখ্যার আবশ্যক নাই, ব্যাকরণের মারপ্যাঁচ করিবার দরকার নাই, যে সকল শ্লোকের দ্বারা যে-সকল ভাব কখনই উদ্দিষ্ট হয় নাই, সেই সকল শ্লোকের ভিতর আমাদের নিজেদের ভাব প্রবেশ করাইবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্লোকের সাদাসিধা অর্থ বুঝা অতি সহজ, আর যখনই আপনারা অধিকার-ভেদের অপূর্ব রহস্য বুঝিবেন, তখনই উহা আপনাদের নিকট অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

ইহা সত্য যে, উপনিষদ্‌সমূহের লক্ষ্য একটি: কি সেই বস্তু, যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা হয় – 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।'[১১] আধুনিক কালের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপনিষদের উদ্দিষ্ট বিষয় হইল চরম একত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা। আর বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান ছাড়া জ্ঞান আর কিছুই নহে। সকল বিজ্ঞানই এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত – সকল মানবীয় জ্ঞানই বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি কতকগুলি ঘটনাচক্রের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধান করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবীয় জ্ঞানের কার্য হয়, তবে এই অপূর্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে – যাহা নামরূপে সহস্র প্রকারে বিভিন্ন, যেখানে জড় ও চৈতন্য ভেদ, যেখানে প্রত্যেক চিত্তবৃত্তি অপরটি হইতে পৃথক্ যেখানে একটি বস্তুর সহিত অপর বস্তুর পার্থক্য বর্তমান, – সেই জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা কি গুরুতর ব্যাপার, ভাবিয়া দেখুন। কিন্তু এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত লোকের মধ্যে, এই-সকল বিভিন্নতার মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করাই উপনিষদের লক্ষ্য। আমরা ইহা বুঝি। অন্য দিকে আবার 'অরুন্ধতী-ন্যায়ে'র প্রয়োগ করিতে হইবে। অরুন্ধতী-নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে উহার নিকটস্থ কোন বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর নক্ষত্র দেখাইয়া উহাতে তাহার দৃষ্টি স্থির হইলে পর ক্ষুদ্রতর অরুন্ধতী দেখাইতে হয়। এভাবেই সূক্ষ্মতম ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার পূর্বে অন্যান্য

---

[১১] মুণ্ডক উপ., ১।৩

অনেক স্থূলতর ভাব বুঝাইয়া পরে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ভাবের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আর কিছু করিতে হইবে না – আপনাদিগকে কেবল উপনিষদ্ দেখাইয়া দিলেই হইবে, তাহা হইলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভেই দ্বৈতবাদ-উপাসনার উপদেশ। প্রথমতঃ তাঁহাকে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্তারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। তিনি আমাদের উপাস্য, শাস্তা, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃ-প্রকৃতির নিয়ন্তা, তথাপি তিনি যেন প্রকৃতির বাহিরে রহিয়াছেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাই, যে-আচার্য উপরি-উক্ত শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই আবার উপদেশ দিতেছেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরে নহেন, প্রকৃতির ভিতরেই বর্তমান রহিয়াছেন। অবশেষে উভয় ভাবই পরিত্যক্ত হইয়াছে, – যাহা কিছু সত্য, সবই তিনি – কোন ভেদ নাই, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। যিনি সমগ্র জগতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তিনিই যে মানবাত্মার মধ্যে বর্তমান, ইহাই শেষে ঘোষণা করা হইয়াছে। এখানে আর কোন প্রকার আপস নাই, এখানে আর অপরের মতামতের অপেক্ষা বা ভয় নাই। সত্য – নিরাবরণ সত্য – এখানে সুস্পষ্ট নির্ভীক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, এবং বর্তমানকালেও আমাদের সেইরূপ নির্ভীক ভাষায় সত্য প্রচার করিতে ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই; ঈশ্বরকৃপায় অন্ততঃ আমি এইরূপ নির্ভীক প্রচারক হইবার ভরসা রাখি।

এখন পূর্বপ্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করিয়া প্রথম জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলির আলোচনা করা যাক। প্রথমতঃ সকল বৈদান্তিক সম্প্রদায় যে-বিষয়ে একমত, সেই জগৎসৃষ্টি-প্রকরণ এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। আমি প্রথমে জগৎসৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়াসমূহ যেন বজ্রবেগে আমাদের উপর পতিত হইয়া, যাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমাদিগকে এমন অদ্ভুত তত্ত্বসমূহের সম্মুখীন করিতেছে। কিন্তু এগুলির অধিকাংশ বহুযুগ পূর্বে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের পুনরাবিষ্ক্রিয়ামাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান এই সে-দিন আবিষ্কার করিয়াছে যে, বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে। বিজ্ঞান সবেমাত্র আবিষ্কার করিয়াছে যে, উত্তাপ তড়িৎ চৌম্বকশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত সমুদয় শক্তিকেই একটি শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে; সুতরাং লোকে উহাদিগকে যে-কোন নামেই অভিহিত করুক না কেন, বিজ্ঞান একটিমাত্র নামের দ্বারাই উহাদিগকে অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু অতি প্রাচীন হইলেও সংহিতিতেও সেই শক্তির এরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। মাধ্যাকর্ষণই বলুন, উত্তাপই বলুন, তড়িৎই বলুন, চৌম্বক শক্তিই বলুন, অথবা অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তিই বলুন, সবই এক শক্তির প্রকাশমাত্র এবং সেই এক শক্তির নাম 'প্রাণ'। প্রাণ কি? প্রাণ অর্থে স্পন্দন। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া যায়, তখন এই অনন্ত শক্তিসমূহ কোথায় যায়? এগুলির কি লোপ হয়, মনে করেন? কখনই নহে। যদি বলেন, শক্তিরাশির একেবারে ধ্বংস হয়, তবে কোন্ বীজ হইতে আবার আগামী জগৎ-তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে? কারণ, এই গতি তো চিরকাল ধরিয়া তরঙ্গাকারে চলিয়াছে – একবার উঠিতেছে, আর একবার পড়িতেছে; আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। এমনি ভাবে অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই জগৎপ্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টি বলে। 'সৃষ্টি' আর ইংরেজী 'creation' শব্দ-দুইটি একার্থক নহে। ইংরেজীতে ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, সংস্কৃত শব্দগুলির যথাসাধ্য অনুবাদ করিয়া বলিতে হয়। 'সৃষ্টি' শব্দের ঠিক অর্থ – প্রকাশ হওয়া, বাহির হওয়া। জগৎপ্রপঞ্চ প্রলয়ের সময় সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া যাহা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই প্রাথমিক অবস্থায় পরিণত হয় – কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় শান্তভাবে থাকে, – আবার ক্রমশঃ প্রকাশোন্মুখ হয়। ইহাই সৃষ্টি। আর এই শক্তিগুলির – প্রাণশক্তির কি হয়? তাহারা আদি-প্রাণে পরিণত হয়; এই প্রাণ তখন প্রায় গতিহীন হয় – সম্পূর্ণরূপে গতিশূন্য কখনই হয় না, আর বৈদিক সূক্তের 'আনীদবাতং'[১২] – গতিহীনভাবে স্পন্দিত হইয়াছিল – এই বাক্যের দ্বারা এই তত্ত্বেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদের অনেক পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। উদাহরণস্বরূপ এই 'বাত' শব্দ ধরুন। কখন কখন ইহার দ্বারা বায়ু বুঝায়, কখন গতি বুঝায়। লোকে অনেক সময় এই দুই অর্থ লইয়া গোল করিয়া থাকে। এই বিষয়ে

[১২] ঋগ্বেদ, ১০।১২৯–৩২

সাবধান হইতে হইবে। আর তখন ভূতের বা জড়পদার্থের কি অবস্থা হয়? শক্তি সর্বভূতে ওতপ্রোত রহিয়াছে। সেই সময় সকলই আকাশে লীন হয় – আবার আকাশ হইতে প্রকাশিত হয়। এই আকাশই আদিভূত। এই আকাশ প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে, আর যখন নূতন সৃষ্টি হইতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন দ্রুত হয়, অমনি এই আকাশ তরঙ্গায়িত হইয়া চন্দ্রসূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে।

অন্য স্থলে আছে – 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' – এই জগতে যাহা কিছু আছে, প্রাণ কম্পিত হইতে থাকিলে সকলই বাহির হয়। এখানে 'এজতি' শব্দটি লক্ষ্য করিবেন – 'এজ্' ধাতুর অর্থ কম্পিত হওয়া। 'নিঃসৃতম্' অর্থ বাহিরে প্রক্ষিপ্ত; 'যদিদং কিঞ্চ' – জগতে যাহা কিছু।

প্রপঞ্চ-সৃষ্টির কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। কি প্রণালীতে সৃষ্টি হয়, কিভাবে প্রথমে আকাশের এবং আকাশ হইতে অন্যান্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, আকাশের কম্পন হইতে বায়ুর উৎপত্তি কিভাবে হয় ইত্যাদি – অনেক কথা বলিতে হয়। তবে ইহার মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট যে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সর্বশেষে স্থূল ভূত উৎপন্ন হয়। ইহাই সর্বাপেক্ষা বাহিরের বস্তু, আর এই স্থূল ভূতের পশ্চাতে সূক্ষ্ম ভূত রহিয়াছে। এতদূর বিশ্লেষণ করিয়াও কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, সমুদয় জগৎকে দুই তত্ত্বে পর্যবসিত করা হইয়াছে মাত্র, এখনও চরম একত্বে পৌঁছানো যায় নাই। শক্তিবর্গ প্রাণরূপ এক শক্তিতে এবং জড়বর্গ আকাশরূপ এক বস্তুতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই দুইটি মধ্যে কি আবার কোনরূপ একত্ব বাহির করা যাইতে পারে? ইহাদিগকেও কি এক তত্ত্বে পর্যবসিত করা যাইতে পারে? আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এখানে নীরব – কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারে নাই, আর যদি ইহার মীমাংসা করিতে হয়, তবে বিজ্ঞান যেমন প্রাচীনদিগের ন্যায় আকাশ ও প্রাণকেই পুনরাবিষ্কার করিয়াছে, সেইরূপ সেই প্রাচীনদিগের পথেই চলিতে হইবে। আকাশ ও প্রাণ যে এক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্বব্যাপী সত্তা, যাঁহার পৌরাণিক নাম ব্রহ্মা – চতুর্মুখ ব্রহ্মা বলিয়া পরিচিত এবং মনোবিজ্ঞানে যাঁহাকে 'মহৎ' বলা যায়। এখানেই উভয়ের মিলন। দার্শনিক ভাষায় যাহা 'মন' বলিয়া কথিত হয়, তাহা মস্তিষ্করূপ ফাঁদে আবদ্ধ সেই মহতের কিয়দংশ। মস্তিষ্কের জালে আবদ্ধ ব্যষ্টি-মনের যোগফলকে 'সমষ্টি মন' বলা যায়।

কিন্তু বিশ্লেষণ এইখানেই শেষ হয় নাই, আরও দূরে অগ্রসর হইয়াছিল। আমরা প্রত্যেকে যেন এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আর সমগ্র জগৎ একটি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। আর ব্যষ্টিতে যাহা হইতেছে, সমষ্টিতেও তাহা ঘটিয়াছে – ইহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। যদি আমরা আমাদের নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিতে পারিতাম, তবে সমষ্টি-মনে কি হইতেছে, তাহাও অনেকটা নিশ্চিতরূপে অনুমান করিতে পারিতাম। এখন প্রশ্নঃ এই মন কি? বর্তমানকালে পাশ্চাত্যদেশে জড়বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শরীরবিজ্ঞান যেমন ধীরে ধীরে প্রাচীন ধর্মের একটির পর আর একটি দুর্গ অধিকার করিয়া লইতেছে, পাশ্চাত্য আর দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না; কারণ আধুনিক শারীরবিজ্ঞান প্রতিপদে মনকে মস্তিষ্কের সহিত মিশাইতেছে দেখিয়া তাহারা হতাশাগ্রস্ত। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা এ সব তত্ত্ব চিরকাল জানি। হিন্দু-বালককে প্রথমেই শিখিতে হয়, মন জড়পদার্থ, – তবে সূক্ষ্মতর জড়। আমাদের এই দেহ স্থূল, কিন্তু এই দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীর বা মন রহিয়াছে; ইহাও জড়, কিন্তু সূক্ষ্মতর; ইহা আত্মা নহে।

এই 'আত্মা' শব্দটি আমি আপনাদের নিকট ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বলিতে পারিতেছি না, কারণ ইওরোপে আত্মা-শব্দের প্রতিপাদ্য কোন ভাবই নাই; অতএব এই শব্দের অনুবাদ করা যায় না। জার্মান দার্শনিকগণ আজকাল এই আত্মা-শব্দটি Self-শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিতেছেন, কিন্তু যতদিন না এই শব্দটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, ততদিন উহা ব্যাবহার করা অসম্ভব। অতএব উহাকে Self-ই বলুন বা আর যাহাই বলুন, আমাদের 'আত্মা' ছাড়া উহা আর কিছু নহে। এই আত্মাই মানুষের অন্তরে যথার্থ মানুষ। এই আত্মাই জড় মনকে উহার যন্ত্র, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ইহার অন্তঃকরণ-রূপে ব্যাবহার করেন, আর মন কতকগুলি

আভ্যন্তরিক যন্ত্রসহায়ে দেহের দৃশ্যমান যন্ত্রগুলির উপর কাজ করে। এই মন কি? এই সে দিন পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, চক্ষু প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় নহে, তাহারও পশ্চাতে প্রকৃত ইন্দ্রিয় বর্তমান; আর যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে সহস্রলোচন ইন্দ্রের মতো মানুষের সহস্র চক্ষু থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবে না।

আপনাদের দর্শন এই স্বতঃসিদ্ধ লইয়াই অগ্রসর হয় যে, দৃষ্টি বলিতে বাহ্য দৃষ্টি বুঝায় না। প্রকৃত দৃষ্টি অন্তরিন্দ্রিয়ের – অভ্যন্তরবর্তী মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহের; আপনি তাহাদের যাহা ইচ্ছা নাম দিতে পারেন; কিন্তু ইন্দ্রিয়- অর্থে আমাদের এই বাহ্য চক্ষু, নাসিকা বা কর্ণ বুঝায় না। আর এই ইন্দ্রিয়সমূহের সমষ্টি মন- বুদ্ধি- চিত্ত– অহঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়াই ইংরেজীতে Mind নামে অভিহিত হয়। আর যদি আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ আসিয়া বলেন যে, মস্তিষ্কই মন এবং ঐ মস্তিষ্ক বিভিন্ন যন্ত্র বা কারণসমূহে গঠিত, তাহা হইলে আপনাদের ভীত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তাহাদিগকে অনায়াসেই বলিতে পারেন, আমাদের দার্শনিকগণ চিরকালই ইহা জানিতেন। ইহা আপনাদের ধর্মের মূলসূত্র।

বেশ কথা, এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কি বুঝায়। প্রথমতঃ চিত্ত কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। চিত্তই প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের মূল উপাদান, ইহা মহতেরই অংশ – মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির সাধারণ নাম। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে বিন্দুমাত্র তরঙ্গরহিত স্থির শান্ত একটি হ্রদকে উদাহরণ- স্বরূপ গ্রহণ করুন। মনে করুন, কোন ব্যক্তি এই হ্রদের উপর একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। তাহা হইলে কি কি ঘটিবে? প্রথমতঃ জলে যে আঘাত করা হইল, সেইটিই যেন একটি ক্রিয়া, তারপরই জল উত্থিত হইয়া প্রস্তরটির দিকে প্রতিক্রিয়া করিল, আর সেই প্রতিক্রিয়া তরঙ্গের আকার ধারণ করিল। প্রথমতঃ জল একটু কম্পিত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া করে। এই চিত্তটি যেন হ্রদ, আর বাহ্য বস্তুগুলি যেন উহার উপর নিক্ষিপ্ত প্রস্তর। যখনই উহা এই ইন্দ্িয়গুলির সহায়তায় কোন বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে আসে – বাহ্য বস্তুগুলির অনুভূতি ভিতরে বহন করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজন – তখনই একটি কম্পন উৎপন্ন হয়; উহা সংশয়াত্মক মন। তারপরই একটি প্রতিক্রিয়া হয় – উহা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, আর এই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহংজ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান উদিত হয়। মনে করুন, আমার হাতের উপর একটি মশা আসিয়া দংশন করিল। এই বাহ্যবস্তু- জনিত বেদনা আমার চিত্তে নীত হইল, উহা একটু কম্পিত হইল – মনোবিজ্ঞানমতে উহার নামই ‘মন’। তাহার পরেই একটি প্রতিক্রিয়া হইল এবং তৎক্ষণাৎ আমার ভিতর এই ভাবের উদয় হইল যে, আমার হাতে একটি মশা বসিয়াছে, সেটিকে তাড়াইতে হইবে। তবে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, হ্রদে যে- সকল আঘাত আসে, সেগুলি সবই বহির্জগৎ হইতে; কিন্তু মনোহ্রদে আঘাত বহির্জগৎ হইতেও আসিতে পারে, আবার অন্তর্জগৎ হইতেও আসিতে পারে। চিত্ত এবং উহার বিভিন্ন অবস্থার নাম ‘অন্তঃকরণ’।

পূর্বে যাহা বর্ণিত হইল, তাহার সহিত আপনাদিগকে আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে ইহা দ্বারা অদ্বৈতবাদ বুঝিবার বিশেষ সাহায্য হইবে।আপনাদের মধ্যে সকলে নিশ্চয়ই মুক্তা দেখিয়াছেন, এবং অনেকেই জানেন – মুক্তা কিভাবে নির্মিত হয়। শুক্তির মধ্যে একটু ধূলি ও বালুকণা প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে, আর শুক্তির দেহ উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালুকণাকে নিজ শরীরনিঃসৃত রসে প্লাবিত করিতে থাকে। উহাই তখন নির্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়। এই মুক্তা যেরূপে গঠিত হয়, আমরা সমগ্র জগৎকে ঠিক সেই ভাবে গঠন করিতেছি। বাহ্যজগৎ হইতে আমরা কেবল উত্তেজনা পাই, এমন কি সেই উত্তেজনার অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয়; আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনের কিছুটাই সেই উত্তেজনার দিকে প্রেরণ করি; আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তখন আমাদের নিজ মন ঐ উত্তেজনা দ্বারা যেভাবে আকারিত হয়, আমরা সেই- ভাবে আকারিত মনকেই জানিতে পারি। যাঁহারা বহির্জগতের বাস্তবতায় বিশ্বাস করিতে চান, তাঁহাদিগকে

এ-কথা মানিতে হইবে, আজকাল শরীরবিজ্ঞানের এই উন্নতির দিনে এ-কথা না মানিয়া আর উপায় নাই যে, যদি বহির্জগৎকে আমরা 'ক' বলিয়া নির্দেশ করি, তবে আমরা প্রকৃতপক্ষে ক+মনকে জানিতে পারি, এবং এই জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে মনের ভাগটি এত অধিক যে, উহা ঐ 'ক'-এর সর্বাংশব্যাপী, আর ঐ 'ক'-এর স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; অতএব যদি বর্হিজগৎ বলিয়া কিছু থাকে, তবে উহা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমাদের মনের দ্বারা উহা যেরূপ আকারে রূপান্তরিত হয়, উহাকে আমরা সেই ভাবেই জানিতে পারি। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে। আত্মাকে জানিতে হইলে উহাকেও আমাদের মনের মধ্য দিয়া জানিতে হয়, অতএব আমরা এই আত্মা সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাহা আত্মা+মন ব্যতীত আর কিছুই নহে। অর্থাৎ মনের দ্বারা আবৃত, মনের দ্বারা পরিণত বা গঠিত আত্মাকেই আমরা জানি। আমরা পরে এই তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। তবে এখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মনে রাখা আবশ্যক।

তারপর আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে। এই দেহ এক নিরবিচ্ছিন্ন জড়স্রোতের নামমাত্র। প্রতিমুহূর্তে আমরা ইহাতে নূতন নূতন উপাদান দিতেছি, প্রতিমুহূর্তে আবার ইহা হইতে অনেক পদার্থ বাহির হইয়া যাইতেছে। যেন একটি সদা প্রবাহিত নদী – উহার রাশি রাশি জল সর্বদাই এক স্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা কল্পনাবলে সমস্তটিকে একবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে সেই একই নদী বলিয়া থাকি। কিন্তু নদীটি প্রকৃতপক্ষে কি? প্রতিমুহূর্তে নূতন নূতন জল আসিতেছে, প্রতি মুহূর্তে নদীর তটভূমি পরিবর্তিত হইতেছে, প্রতি মুহুর্তে তীরবর্তী বৃক্ষলতা এবং পত্রপুষ্পফলাদির পরিবর্তন ঘটিতেছে। তবে নদীটি কি? নদী এই পরিবর্তন-সমষ্টির নামমাত্র। মনের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। বৌদ্ধেরা এই ক্রমাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই মহান 'ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ' মতের সৃষ্টি করেন। উহা ঠিক ঠিক বুঝা অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে এই মত সুদৃঢ় যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর ভারতে বেদান্তের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধে এই মত উত্থিত হইয়াছিল। এই মতকে নিরস্ত করার প্রয়োজন হইয়াছিল, আমরা পরে দেখিব, কেবল অদ্বৈতবাদই এই মতকে খণ্ডন করিতে সমর্থ, আর কোন মতই নহে। আমরা পরে ইহাও দেখিব যে, অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে লোকের নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা সত্ত্বেও, অদ্বৈতবাদের নামে ভয় পাওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক ইহাতেই জগতের পরিত্রাণ; কারণ এই অদ্বৈতবাদেই সব কিছুর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উপাসনাপ্রণালী হিসাবে দ্বৈতবাদ প্রভৃতি খুব ভাল বটে, ঐগুলি মনের খুব তৃপ্তিকর বটে; হইতে পারে – ঐগুলি মনকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে, কিন্তু যদি কেহ একই সঙ্গে যুক্তিবিচারশীল এবং ধর্মপরায়ণ হইতে চায়, তবে তাহার পক্ষে অদ্বৈতবাদই একমাত্র পন্থা।

যাহা হউক, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মনও দেহের মতো একটি নদীস্বরূপ – নিয়তই একদিকে শূন্য হইতেছে, অপরদিকে পূর্ণ হইতেছে; তবে সেই একত্ব কোথায়, যাহাকে আমরা 'আত্মা' বলিয়া অভিহিত করি? আমরা দেখি, আমাদের দেহে ও মনে এইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তন হইতে থাকিলেও আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অপরিবর্তনীয় – যাহার জন্য আমাদের ধারণাগুলি অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে হয়। যদি বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন আলোকরাশি আসিয়া একটি যবনিকা বা দেয়াল বা অপর কোন অচল বস্তুর উপর পড়ে, তখন – কেবল তখনই ঐগুলি এক অখণ্ড সমষ্টির আকার ধারণ করিতে পারে। মানুষের বিভিন্ন শারীরযন্ত্রসমূহের মধ্যে কোথায় সেই নিশ্চল অখণ্ড বস্তু, যাহার উপর বিভিন্ন ভাবরাশি পতিত হইয়া অখণ্ডত্বের ভাব প্রাপ্ত হইতেছে? অবশ্য মন কখনও সেই বস্তু হইতে পারে না, কারণ মনও পরিবর্তনশীল। অতএব এমন কিছু বস্তু অবশ্যই আছে, যাহা দেহও নহে, মনও নহে, যাহার কখন পরিণাম হয় না, যাহার উপর আমাদের সমুদয় ভাবরাশি, সমুদয় বাহ্য বিষয় আসিয়া এক অখণ্ডভাবে পরিণত হয় – ইহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের আত্মা। আর যখন দেখিতে পাইতেছি সমুদয় জড়পদার্থ – তাহাকে সূক্ষ্ম জড় অথবা মন যে-নামেই অভিহিত করুন না – এবং সমুদয় স্থূল, জড় বা বাহ্য জগৎ উহার সহিত তুলনায় পরিবর্তনশীল, তখন এই অপরিবর্তনীয় বস্তুটি কখনই জড় পদার্থ হইতে পারে না; অতএব উহা চৈতন্যস্বভাব অর্থাৎ জড় নয়; উহা অবিনাশী ও অপরিণামী।

তাহার পর আর একটি প্রশ্ন আসে। অবশ্য বাহ্য জগৎ দেখিয়া 'কে উহা সৃষ্টি করিল, কে জড় পদার্থ সৃষ্টি করিল?' – এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ক্রমশঃ উদ্দেশ্যবাদ আনিবার যে পূর্বপ্রচলিত যুক্তি রহিয়াছে – আমি তাহার কথা বলিতেছি না। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি হইতেই সত্যকে জানা হইবে – আত্মা সম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন উঠিয়াছিল, এ প্রশ্নও ঠিক সেইভাবেই উঠিয়াছিল। যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র এক-একটি অপরিবর্তনীয় আত্মা আছেন, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই-সকল আত্মার মধ্যে ধারণা, ভাব ও সহানুভূতির ঐক্য বিদ্যমান। নতুবা কি করিয়া আমার আত্মা আপনার আত্মার উপর কাজ করিবে? সেই মধ্যবর্তী বস্তু কি, যাহার মধ্য দিয়া এক আত্মা অপর আত্মার উপর কাজ করিবে? আপনাদের আত্মা সম্বন্ধে আমি যে কিছু অনুভব করিতে পারি, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এমন কি বস্তু আছে, যাহা আপনার ও আমার উভয়ের আত্মাকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? অতএব অপর একটি আত্মা স্বীকার করিবার দার্শনিক আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে – যে-আত্মা সমুদয় বিভিন্ন আত্মা ও জড় বস্তুর মধ্য দিয়া কাজ করিবে, যে-আত্মা জগতের অসংখ্য আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিবে, যে-আত্মার সহায়তায় অপর আত্মাসমূহ প্রাণবন্ত হইবে, পরস্পরকে ভালবাসিবে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে, পরস্পরের জন্য কাজ করিবে। এই সর্বব্যাপী আত্মাই 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত, তিনি সমগ্র জগতের প্রভু, ঈশ্বর। আবার আত্মা যখন জড়পদার্থনির্মিত নহে – চৈতন্যস্বরূপ, তখন উহা জড়ের নিয়মগুলি অনুসরণ করিতে পারে না, জড়ের নিয়মানুসারে উহার বিচার চলিতে পারে না; অতএব আত্মা অবিনাশী ও অপরিণামী।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥[১৩]

–অগ্নি এই আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে না, কোন অস্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, তরবারি ইহাকে কাটিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না – এই মানবাত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, নিশ্চল ও চিরন্তন।

গীতা ও বেদান্তমতে এই জীবাত্মা বিভু, কপিলের মতেও ইহা সর্বব্যাপী। অবশ্য ভারতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে এই জীবাত্মা অণু, কিন্তু তাহাদেরও মত এই যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিভু, ব্যাক্ত অবস্থায় উহা অণু। তারপর আর একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। ইহা সম্ভবতঃ আপনাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই তত্ত্বটিও বিশেষভাবে ভারতীয় – আর এই বিষয়টি আমাদের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্তমান। এই জন্য আমি আপনাদিগকে এই তত্ত্বটির প্রতি অবহিত হইতে এবং উহা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ ইহা – ভারতীয় বলিতে যাহা কিছু, সে-সকলেরই ভিত্তিস্বরূপ। আপনারা জার্মান ও ইংরেজ পণ্ডিত কর্তৃক পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত শারীর-পরিণামবাদের (doctrine of physical evolution) বিষয় শুনিয়াছেন। ঐ মতে সকল প্রাণীর শরীর প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন; আমরা যে ভেদ দেখি, তাহা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশমাত্র আর ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম সাধু পর্যন্ত সকলেই প্রকৃতপক্ষে এক, একটি অপরটিতে পরিণত হইতেছে, আর এইরূপ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রেও এই পরিণামবাদ রহিয়াছে।

যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ'।[১৪]

---

[১৩] গীতা, ২।২৩–২৪
[১৪] যোগসূত্র, ৪।২

– অর্থাৎ এক জাতি অপর জাতিতে, এক শ্রেণী অপর শ্রেণীতে পরিণত হয়। তবে ইওরোপীয়দিগের সহিত আমাদের প্রভেদ কোন্ খানে? – 'প্রকৃত্যাপূরাৎ' – প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা। ইওরোপীয়গণ বলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাকৃতিক ও যৌন- নির্বাচন প্রভৃতি এক প্রাণীকে অপর প্রাণীর শরীর গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এই জাত্যন্তরপরিণামের যে হেতু নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, ভারতীয়েরা ইওরোপীয়গণ অপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতির আপূরণের অর্থ কি? আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, জীবাণু ক্রমশঃ উন্নত ইহয়া বুদ্ধ- রূপে পরিণত হয়। আমরা ইহা স্বীকার করিলেও আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, কোন যন্ত্রে কোন না কোন আকারে যদি উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ না করা যায়, তবে তাহা হইতে তদানুরূপ কাজ পাওয়া যায় না। যে আকারই ধারণ করুক না, শক্তিসমষ্টি চিরকালই সমান। একপ্রান্তে যদি শক্তির বিকাশ দেখিতে চাও, তবে অপর প্রান্তে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে; হইতে পারে – উহা অন্য আকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পরিমাণ এক হওয়া চাই- ই চাই। অতএব বুদ্ধ যদি পরিণামের এক প্রান্ত হন, তবে অপর প্রান্তের জীবাণুও অবশ্য বুদ্ধতুল্য হইবে। বুদ্ধ যদি ক্রমবিকশিত জীবাণু হন, তবে ঐ জীবাণুও নিশ্চয়ই ক্রমসঙ্কুচিত বুদ্ধ। যদি এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শক্তির বিকাশ হয়, তবে প্রলয়কালেও সেই অনন্তশক্তি সঙ্কুচিতভাবে থাকিবে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্য কোন ভাব সম্ভব নয়। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত। আমাদের পদতলসঞ্চারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম সাধু পর্যন্ত সকলেরই ভিতর অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও সমুদয় গুণই অনন্ত পরিমাণে রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল প্রকাশ্যের তারতম্যে। কীটে সেই মহাশক্তির অতি অল্প পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, আপনাতে তাহা অপেক্ষা অধিক, আবার অপর একজন দেবতুল্য মানবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে – এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু সকলের মধ্যেই সেই এক শক্তি রহিয়াছে।

পতঞ্জলি বলিতেছেন, 'ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'।[১৫]

–কৃষক যেরূপ তাহার ক্ষেত্রে জলসেচন করে। কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট জলাশয় হইতে একটি প্রণালী কাটিয়াছি, ঐ প্রণালীর মুখে একটি কপাট আছে; পাছে সমুদয় জল গিয়া ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া দেয়, এই জন্য ঐ কপাট বন্ধ রাখা হয়। যখন জলের প্রয়োজন হয়, তখন ঐ কপাট খুলিয়া দিলেই জল নিজ শক্তিবলেই উহার ভিতরে প্রবেশ করে। জলের শক্তি বাড়াইতে হইবে না, জলাশয়ের জলে পূর্ব হইতেই ঐ শক্তি রহিয়াছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বীর্য, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার রহিয়াছে, কেবল এই কপাট, দেহরূপ এই কপাট – আমাদের যথার্থ এবং পূর্ণ বিকাশ হইতে দিতেছে না। আর যতই এই দেহের গঠন উন্নত হইতে থাকে, যতই তমোগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ সত্ত্বগুণে পরিণত হয়, ততই এই শক্তি ও শুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে; এই জন্যই আমরা পানাহার সম্বন্ধে এত সাবধান।

হইতে পারে, আমরা মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি – যেমন আমাদের বাল্য- বিবাহ- সম্বন্ধে; যদিও এ- বিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি দৃষ্টান্তরূপে আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি। যদি উপযুক্ত অবসর পাই, তবে আমি এই- সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব। তবে ইহা বলিয়া রাখি যে, বাল্য- বিবাহ- প্রথা যে- সকল মূলভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই- সকল ভাব অবলম্বন করিয়াই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে। যদি প্রত্যেক নর নারীকে অপর যে কোন নর নারীকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ ও পাশবপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে চলিতে থাকে, তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে – দুষ্টপ্রকৃতি অসুরস্বভাব সন্তানসমূহের উৎপত্তি হইবে। একদিকে প্রত্যেক দেশে মানুষ এই সকল পশু- প্রকৃতি সন্তান উৎপাদন করিতেছে, অপর দিকে তাহাদিগকে বশে রাখিবার জন্য পুলিশ বাড়াইতেছে। এভাবে সামাজিক ব্যাধির

[১৫] যোগসূত্র ৪।৩

প্রতিকারের চেষ্টায় বিশেষ ফল নাই, বরং কিভাবে সমাজ হইতে এই-সকল দোষ, এই-সকল পশু-প্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি নিবারিত হইতে পারে, তাহাই মহাসমস্যা। আর যতদিন আপনি সমাজে বাস করিতেছেন, ততদিন আপনার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকেই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং আপনার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়, এ বিষয়ে আপনাকে আদেশ করিবার অধিকার সমাজের আছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহ-প্রথার পশ্চাতে এই-সকল উচ্চতর ভাব ও তত্ত্ব রহিয়াছে – কোষ্ঠীতে বরকন্যার যেরূপ 'জাতি' 'গণ' প্রভৃতি লিখিত থাকে, এখনও তদনুসারেই হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিতে চাই যে, মনুর মতে কামোদ্ভূত পুত্র 'আর্য' নহে। যে সন্তানের জন্মমৃত্যু বেদের বিধানুযায়ী, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আর্য। আজকাল সকল দেশেই এইরূপ আর্যসন্তান খুব অল্পই জন্মিতেছে এবং তাহার ফলেই কলিযুগ নামক দোষরাশির উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা প্রাচীন মহান আদর্শসমূহ ভুলিয়া গিয়াছি। সত্য বটে যে, আমরা এখন এই-সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিতে পারি না; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা এই সকল মহান ভাবের কতকগুলিকে লইয়া একটা বিকৃত হাস্যকর ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছি। অতি দুঃখের বিষয় যে, আজকাল আর প্রাচীন কালের মতো পিতামাতা নাই, সমাজও এখন পূর্বের মতো শিক্ষিত নয়, আর পূর্বে যেমন সমাজভুক্ত সকল লোকের উপর একটা ভালবাসা ছিল, এখনকার সমাজে তাহা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কার্যকালে যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন, মূল তত্ত্বটি নির্দোষ, আর যদি ঐ তত্ত্ব ঠিকমত কাজে পরিণত না হইয়া থাকে, যদি প্রণালী-বিশেষ বিফল হইয়া থাকে, তবে মূল তত্ত্বটি লইয়া যাহাতে উহা ভালভাবে কাজে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করুন। মূল তত্ত্বটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন কেন?

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ঐ তত্ত্বও যেভাবে কাজে পরিণত হইতেছে, তাহা খুব খারাপ বটে, কিন্ত তাহাতে ঐ তত্ত্বের কোন দোষ নাই। উহা সনাতন, চিরকালই উহা থাকিবে। তত্ত্বটি যাহাতে ভাল করিয়া কাজে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করুন।

ভারতে আমাদের সকল সম্প্রদায়কে আত্মা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মহান তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে হয়। শুধু দ্বৈতবাদীরা বলেন – পরে আমরা ইহা বিশেষভাবে দেখিব – অসৎকর্মের দ্বারা উহা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়, উহার সমুদয় শক্তি ও স্বভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আবার সৎকর্মের দ্বারা সেই স্বভাবের বিকাশ হয়। অদ্বৈতবাদী বলেন, আত্মার কখনই সঙ্কোচ বা বিকাশ কিছুই হয় না, এরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় মাত্র। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। তবে সকলেই এ-কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আত্মাতে পূর্ব হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত, বাহির হইতে কোন কিছু যে আত্মাতে আসিবে তাহা নহে, কোন জিনিস যে উহাতে আকাশ হইতে পড়িবে, তাহা নহে। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, আপনাদের বেদসমূহ inspired – বাহির হইতে ভিতর আসিতেছে এরূপ নহে, expired – ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে, বেদসমূহ প্রত্যেক আত্মায় নিহিত সনাতন নিয়মাবলী। পিপীলিকা হইতে দেবতা পর্যন্ত সকলেরই আত্মায় বেদ অবস্থিত। পিপীলিকাকে শুধু বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া ঋষিদেহ লাভ করিতে হইবে; তখনই তাহার ভিতর বেদ অর্থাৎ সনাতন নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে। এই মহান তত্ত্বটি বুঝা বিশেষ প্রয়োজন যে, আমাদের ভিতরে পূর্ব হইতেই শক্তি বর্তমান, মুক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের ভিতরে রহিয়াছে। হয় বলুন – শক্তি সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা বলুন – মায়ার আবরণে আবৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব হইতেই উহা ভিতরে রহিয়াছে। আপনাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে; প্রত্যেকের ভিতরে অনন্ত শক্তি যে গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে – বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বুদ্ধের ভিতর যে-শক্তি রহিয়াছে, অতি নিম্নতম মানুষের মধ্যেও তাহা রহিয়াছে। ইহাই হিন্দুদের আত্মতত্ত্ব।

কিন্তু এইখানেই বৌদ্ধদের সহিত মহা বিরোধ আরম্ভ। বৌদ্ধেরা দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, দেহ একটি জড়স্রোত-মাত্র; সেইরূপ মনকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাকেও এইরূপ একটি জড়প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করেন। আত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন: উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। উহার অস্তিত্ব অনুমান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন

নাই। একটি দ্রব্য এবং ঐ দ্রব্যসংলগ্ন গুণরাশির কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? আমরা শুধু গুণই স্বীকার করিয়া করিয়া থাকি। যেখানে একটি কারণ স্বীকার করিলেই সব কিছুর ব্যাখ্যা হয়, সেখানে দুইটি কারণ স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ। এইরূপে বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হইল, আর যে-সকল মত দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিত, বৌদ্ধেরা সে-সকল মতই খণ্ডন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। যাহারা দ্রব্য ও গুণ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা বলে – তোমার একটি আত্মা, আমার একটি আত্মা, প্রত্যেকেরই শরীর ও মন হইতে পৃথক একটি একটি আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, তাহাদের মতে বরাবরই একটু ত্রুটি ছিল। অবশ্য দ্বৈতবাদের মত এ পর্যন্ত ঠিক; ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই শরীর রহিয়াছে, এই সূক্ষ্ম মন রহিয়াছে, আর সকল আত্মার ভিতর সেই পরমাত্মা রহিয়াছেন। এখানে সমস্যা এইটুকু যে, এই আত্মা ও পরামাত্মা উভয়ই বস্তু, আর উহাদের উপর দেহ মন প্রভৃতি গুণরূপে লাগিয়া রহিয়াছে – স্বীকার করা হয়। এখন কথা এই – কেহই কখন 'বস্তু' দেখে নাই, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও পারে না। অতএব তাঁহারা বলেন, এই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী হইয়া বলুন না কেন যে, মানসিক তরঙ্গরাজি ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই? মানসিক তরঙ্গগুলি কেহই পরস্পরের সহিত সংলগ্ন নহে, উহারা মিলিয়া একটি বস্তু হয় নাই, সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় একটির পশ্চাতে আর একটি চলিয়াছে, উহারা কখনই সম্পূর্ণ নহে, কখনই উহারা একটি অখণ্ড একত্ব গঠন করে না। মানব কেবল এইরূপ তরঙ্গপরম্পরামাত্র – একটি তরঙ্গ চলিয়া যায়, যাইবার সময় আর একটির জন্ম দিয়া যায়, এইরূপ চলিতে থাকে; আর এই-সকল তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই 'নির্বাণ' বলে।

আপনারা দেখিতেছেন, দ্বৈতবাদ এই মতের নিকট নীরব; দ্বৈতবাদের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রকার যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করা অসম্ভব; দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরও এখনে টিকিতে পারেন না। সর্বব্যাপী অথচ ব্যক্তিবিশেষ, হস্ত বিনা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চরণ বিনা যিনি গমন করেন ইত্যাদি, কুম্ভকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, সেইরূপে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন – বৌদ্ধ বলেন, ঈশ্বর যদি এইরূপ হন, তবে তিনি সেই ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই জগৎ দুঃখপূর্ণ; ইহা যদি ঈশ্বরের কার্য হয়, বৌদ্ধ বলেন – তবে তিনি এরূপ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আর দ্বিতীয়তঃ এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক ও অসম্ভব। আপনারা সকলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। যাঁহারা জগতের রচনাকৌশল দেখিয়া উহার একজন পরমকৌশলী নির্মাতার অস্তিত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের যুক্তিসমূহের দোষ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই – ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরাই তাঁহাদের সমুদয় যুক্তিজাল একেবারে খণ্ডন করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর আর টিকিতে পারিলেন না।

আপনারা বলিয়া থাকেন যে, সত্য – শুধু সত্যই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। 'সত্যমেব জয়তে নানৃত্যং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ'।[১৬] – সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, মিথ্যা কখন জয়লাভ করে না, সত্যের দ্বারাই দেবযানমার্গ-লাভ হয়। সকলেই সত্যের পতাকা উড়াইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা কেবল দুর্বল ব্যক্তিকে পদদলিত করিবার জন্য। আপনাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় দ্বৈতবাদাত্মক ধারণা লইয়া প্রতিমাপূজক গরীব বেচারার সহিত বিবাদ করিতে যাইতেছেন, ভাবিতেছেন – আপনারা ভারি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া দিতে পারেন; আর সে যদি ঘুরিয়া আপনার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে কাল্পনিক বলে, তখন আপনি যাইবেন কোথায়? আপনি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাকেন, অথবা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'নাস্তিক' নামে অভিহিত করিয়া চীৎকার করিতে থাকেন; দুর্বল লোকে তো চিরকালই চীৎকার করিয়া থাকে, যে আমাকে পরাস্ত করিবে – সেই নাস্তিক!

[১৬] মুণ্ডক উপ, ৩।১।৬

যদি যুক্তিবাদী হইতে চাহেন, তবে বরাবর যুক্তিবাদী হউন, যদি না পারেন তবে আপনি নিজের জন্য যেটুকু স্বাধীনতা চাহেন, অপরকে সেটুকু দেন না কেন? এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব আপনি কিভাবে প্রমাণ করিবেন? অপর দিকে, প্রমাণ করা যাইতে পারে – ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। তাঁহার অস্তিত্ব-বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, বরং নাস্তিত্ব-বিষয়ে কতকগুলি প্রমাণ আছে। আপনার ঈশ্বর, তাঁহার গুণ, দ্রব্যস্বরূপ অসংখ্য জীবাত্মা, আবার প্রত্যেক জীবাত্মাই ব্যক্তি – এই-সকল লইয়া আপনি কেমন করিয়া তাঁহার অস্বিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন? আপনি ব্যক্তি কিসে? দেহ হিসাবে আপনি ব্যক্তি নহেন, কারণ আপনারা আজ প্রাচীন বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও ভালরূপে জানেন যে, এক সময় হয়তো যে পদার্থ সূর্যে ছিল, আজ তাহারা আপনাতে আসিয়া থাকিতে পারে, আর হয়তো এখনই বাহির হইয়া গিয়া বৃক্ষলতাদিতে থাকিতে পারে। তবে আপনার ব্যক্তিত্ব কোথায়? মনের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তবে আপনার ব্যক্তিত্ব কোথায়? আজ আপনার এক রকম ভাব, আবার কাল আর এক ভাব! যখন শিশু ছিলেন তখন যেরূপ চিন্তা করিতেন, এখন আর সেরূপ চিন্তা করেন না; যুবা-অবস্থায় মানুষ যেরূপ চিন্তা করিয়াছে বৃদ্ধ হইয়া সেরূপ চিন্তা করে না। তবে আপনার ব্যক্তিত্ব কোথায়? জ্ঞানেই আপনার ব্যক্তিত্ব – এ-কথা বলিবেন না, জ্ঞান অহংতত্ত্বমাত্র, আর উহা আপনার প্রকৃত অস্তিত্বের অতি সামান্য-অংশব্যাপী। আমি যখন আপনার সহিত কথা বলি, তখন আমার সকল ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে, কিন্ত আমি সে সম্বন্ধে জানিতে পারি না। যদি জ্ঞানই অস্তিত্বের প্রমাণ হয়, তবে বলিতে হইবে ইন্দ্রিয়সমূহ নাই, কারণ আমি তো উহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারি না। তবে আর আপনার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদগুলি কোথায় দাঁড়ায়? এরূপ ঈশ্বর আপনি কিভাবে প্রমাণ করিতে পারেন?

আবার বৌদ্ধেরা উঠিয়া বলিলেন: ইহা যে শুধু অযৌক্তিক তাহা নহে, এরূপ বিশ্বাস নীতিবিরূদ্ধও বটে, কারণ উহা মানুষকে কাপুরুষ হইতে এবং বাহিরের সাহায্য প্রার্থনা করিতে শিখায় – কেহই কিন্ত তাহাকে এরূপ সাহায্য করিতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, মানুষই ইহা এরূপ করিয়াছে। তবে কেন বাহিরের একজন কাল্পনিক ব্যক্তিবিশেষে বিশ্বাস করিবেন, যাঁহাকে কেহ কখন দেখে নাই বা অনুভব করে নাই, অথবা যাঁহার নিকট হইতে কেহ কখনও সাহায্য পায় নাই? তবে কেন নিজেদের কাপুরুষ করিয়া ফেলিতেছেন, আর আপনাদের সন্তান-সন্ততিকে শিখাইতেছেন যে, মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা কুকুরের মতো হওয়া, এই কাল্পনিক পুরুষের সম্মুখে নিজেকে দুর্বল, অপবিত্র ও জগতে অতি হেয় অপদার্থ মনে করিয়া হাঁটু গাড়িয়া থাকা?

অপর দিকে বৌদ্ধগণ আপনাকে বলিবেন: আপনি নিজেকে এইরূপ বলিয়া শুধু যে মিথ্যাবাদী হইতেছেন তাহা নহে, পরন্তু আপনার সন্তানসন্ততিরও ঘোর অনিষ্টের কারণ হইতেছেন। কারণ এইটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবেন যে, লোকে যেমন চিন্তা করে, তেমনই হইয়া যায়। নিজেদের সম্বন্ধে আপনারা যেমন বলিবেন, ক্রমশঃ আপনাদের তেমনি বিশ্বাস দাঁড়াইবে। ভগবান বুদ্ধের প্রথম কথাই এই – তুমি যাহা ভাবো, তাহাই হইয়াছে; যাহা ভাবিবে, আবার তাহাই হইবে। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কখন ভাবিবেন না যে, আপনি কিছুই নহেন; আর যতক্ষণ না আপনি এমন কাহারও সাহায্য পাইতেছেন – যিনি এখানে থাকেন না, মেঘরাশির উপর বাস করেন – ততক্ষণ আপনি কিছু করিতে পারেন না, ইহাও ভাবিবেন না। ঐরূপ ভাবিলে তাহার ফল হইবে এই যে, আপনি দিন দিন অধিকতর দুর্বল হইয়া যাইবে। আমরা অতি অপবিত্র, হে প্রভো, আমাদিগকে পবিত্র কর – এইরূপ বলিতে বলিতে নিজেকে এমন দুর্বল করিয়া ফেলিবেন যে, তাহার ফলে সকল প্রকার পাপের দ্বারা সম্মোহিত হইবেন।

বৌদ্ধেরা বলেনঃ প্রত্যেক সমাজে যে-সকল পাপ দেখিতে পাও, তাহার শতকরা নব্বই ভাগ আসিয়াছে এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতে, তাহার সম্মুখে কুকুরের মতো হইয়া থাকার ধারণা হইতে; এই অপূর্ব মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এইরূপ কুকুরের মতো হইয়া থাকা – ইহা অতি ভয়ানক কথা! বৌদ্ধ বৈষ্ণবকে বলেন: যদি তোমার আদর্শ, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই হয় যে, ভগবানের বাসস্থান বৈকুন্ঠনামক স্থানে গিয়া

অনন্তকাল তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তবে তাহা অপেক্ষা বরং আত্মহত্যা শ্রেয়ঃ। বৌদ্ধ বলিতে পারেন, তিনি এইটি এড়াইবার জন্যই নির্বাণ বা বিলুপ্তির চেষ্টা করিতেছেন।

আমি আপনাদের নিকট ঠিক একজন বৌদ্ধের মতো হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছি, কারণ আজকাল লোকে বলিয়া থাকে যে, অদ্বৈতবাদের দ্বারা মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ হয়। সেইজন্য অপর পক্ষেরও কি বলিবার আছে, সেইটিই আপনাদের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদিগকে দুই পক্ষই নির্ভীকভাবে দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি, একজন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন – ইহা প্রমাণ করা যায় না। আজকাল কি বালকও এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে – যেহেতু কুম্ভকার ঘট নির্মাণ করে, অতএব ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে কুম্ভকারও তো একজন ঈশ্বর! আর যদি কেহ আপনাকে বলে, মাথা ও হাত না থাকিলেও ঈশ্বর কাজ করেন, তবে তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠাইতে পারেন। আপনার জগৎ-সৃষ্টিকর্তা এই ব্যক্তিবিশেষ – যাঁহার নিকট আপনি সারাজীবন ধরিয়া চিৎকার করিতেছেন – তিনি কি কখনও আপনাকে সাহায্য করিয়াছেন? যদি করিয়াই থাকেন, তবে আপনি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছ? আধুনিক বিজ্ঞান আপনাদিগকে এই আর একটি প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিবার জন্য আহ্বান করে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়া দিবে যে, এরূপ যাহা কিছু সাহায্য আপনি পাইয়াছেন, তাহা আপনি নিজের চেষ্টাতেই পাইতে পারেন। পক্ষান্তরে, আপনার এরূপ বৃথা ক্রন্দনে শক্তিক্ষয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, এরূপ ক্রন্দনাদি না করিয়াও আপনি অনায়াসে ঐ উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারিতেন। অধিকন্ত আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতেই পৌরোহিত্য ও অন্যান্য অত্যাচার আসিয়া থাকে। যেখানেই এই ধারণা ছিল, সেইখানেই অত্যাচারও পৌরোহিত্য রাজত্ব করিয়াছে, আর যতদিন না এই মিথ্যাভাবকে সমূলে বিনাশ করা হয়, বৌদ্ধগণ বলেন, ততদিন এই অত্যাচারের কখন নিবৃত্তি হইবে না। যতদিন মানুষের এই ধারণা থাকে যে, অপর কোন অলৌকিক পুরুষের নিকট তাহাকে নত হইয়া থাকিতে হইবে, ততদিনই পুরোহিতের অস্তিত্ব থাকিবে। পুরোহিতরা কতকগুলি অধিকার ও সুবিধা দাবি করিবে, যাহাতে মানুষ তাহাদের নিকট মাথা নোয়ায় তাহার চেষ্টা করিবে, আর বেচারা মানুষগুলিও তাহাদের কথা ঈশ্বরকে জানাইবার জন্য একজন পুরোহিত চাহিতে থাকিবে। আপনারা ব্রাহ্মণজাতিকে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, যাহারা তাহাদিগকে নির্মূল করিবে, তাহারাই আবার ব্রাহ্মণদের স্থান অধিকার করিয়া লইবে, এবং তাহারা আবার ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ ব্রাহ্মণদের বরং কতকটা সহৃদয়তা ও উদারতা আছে; কিন্তু এই ভূঁইফোড়েরা চিরকালই অতি ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া থাকে। ভিখারী যদি কিছু টাকা পায়, তবে সে সমগ্র জগৎকে খড়কুটা জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব যতদিন এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা থাকিবে, ততদিন এই-সকল পুরোহিতও থাকিবে, আর সমাজে কোন প্রকার উচ্চনীতির অভ্যুদয়ের আশা করা যাইতে পারিবে না। পৌরহিত্য ও অত্যাচার চিরকালই এক সঙ্গে থাকিবে।

লোকে কেন এই ঈশ্বর কল্পনা করিল? কারণ প্রাচীনকালে কয়েকজন বলবান্ ব্যক্তি সাধারণ লোককে বশ করিয়া বলিয়াছিল, তোমাদিগকে আমাদের হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তোমাদের সমূলে বিনাশ করিব। এইরূপ লোকই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিল – ইহার অন্য কোন কারণ নাই – 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।' একজন বজ্রহস্ত পুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে, তাহাকেই তিনি বিনাশ করেন।

বৌদ্ধ বলিতেছেন: তোমরা যুক্তিবাদী হইয়া বলিতেছ, সবই কর্মফলে হইয়াছে। তোমরা সকলেই অসংখ্য জীবাত্মায় বিশ্বাসী, আর তোমাদের মতে এই-সকল জীবাত্মার জন্ম মৃত্যু নাই। এ পর্যন্ত বেশ যুক্তি ও ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। কারণ থাকিলেই কার্য থাকিবে; বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা অতীত কারণের ফল; আবার এই বর্তমান ভবিষ্যতে অন্য ফল প্রসব করিবে। হিন্দু বলিতেছেন: কর্ম জড়, চৈতন্য নহে; সুতরাং কর্মের ফললাভ করিতে হইলে কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন।

বৌদ্ধ তাহাতে বলেন: বৃক্ষ হইতে ফললাভ করিতে গেলে কি চৈতন্যের প্রয়োজন হয়? যদি বীজ পুঁতিয়া গাছে জল দেওয়া হয়, তাহার ফল পাইতে তো কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন হয় না। বলিতে পারো, আদি চৈতন্যের শক্তিতে এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জীবাত্মাগণই তো চৈতন্য, অন্য চৈতন্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? যদি জীবাত্মাদের চৈতন্য থাকে, তবে ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রয়োজন কি? অবশ্য বৌদ্ধেরা জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন; কিন্তু জৈনরা জীবাত্মায় বিশ্বাসী, অথচ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না।

তবে হে দ্বৈতবাদিন্, আপনার যুক্তি কোথায় রহিল, আপনার নীতির ভিত্তি কোথায় রহিল? যখন আপনারা অদ্বৈতবাদের উপর দোষারোপ করিয়া বলেন যে, অদ্বৈতবাদ হইতে দুর্নীতির সৃষ্টি হইবে, তখন একবার ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন; আদালতে দ্বৈতবাদীদের নীতি পরায়ণতার কিরূপ প্রমাণ পান, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখুন। যদি অদ্বৈতবাদী কুড়ি হাজার দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে, তবে দ্বৈতবাদীও কুড়ি হাজার দেখিতে পাইবেন। মোটামুটি বলিতে গেলে বলিতে হয়, দ্বৈতবাদী দুর্বৃত্তের সংখ্যাই অধিক হইবে; কারণ অদ্বৈতবাদ বুঝিতে উৎকৃষ্টতর চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, আর তাহাদিগকে সহজে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ করাইবার উপায় নাই। তবে আপনি যাইবেন কোথায়? বৌদ্ধদের হাত এড়াইবেন কিরূপে? আপনি বেদের বচন উদ্ধৃত করিতে পারেন, কিন্তু বৌদ্ধ তো বেদ মানে না। সে বলিবে: আমার ত্রিপিটক এ-কথা বলে না। ত্রিপিটক অনাদি অনন্ত – এমন কি উহা বুদ্ধের লেখাও নহে; কারণ বুদ্ধ বলিয়াছেন, তিনি সনাতন সত্যেরই আবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। বৌদ্ধ আরও বলেন, তোমাদের বেদ মিথ্যা, আমাদের ত্রিপিটকই যথার্থ বেদ, তোমাদের বেদ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের কল্পিত – সেগুলি দূর করিয়া দাও। এখন আপনি যাইবেন কোথায়?

বৌদ্ধদের যুক্তিজাল কাটিয়া বাহির হইবার উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। দ্রব্য ও গুণ ভিন্ন – এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই প্রথম আপত্তি – এটি একটি দার্শনিক আপত্তি। অদ্বৈতবাদী বলেন: না, উহারা ভিন্ন নহে। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আপনারা 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'-এর সেই প্রাচীন দৃষ্টান্ত অবগত আছেন। যখন আপনি সর্প দেখিতেছেন, তখন রজ্জু একেবারেই দেখিতে পান না, রজ্জু তখন একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। কোন বস্তুকে দ্রব্য ও গুণ বলিয়া বিভক্ত করা দার্শনিকদের মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাপারমাত্র, উহার কোন যথার্থ ভিত্তি নাই, দ্রব্য ও গুণ বলিয়া পৃথক দুইটি পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। আপনি যদি একজন সাধারণ ব্যক্তি হন, শুধু গুণরাশিই দেখিবেন, আর যদি আপনি একজন মস্ত যোগী হন, কেবল দ্রব্যই দেখিবেন, কিন্তু একই সময়ে কখনও দ্রব্য ও গুণ দুই-ই দেখিতে পাইবেন না। অতএব হে বৌদ্ধ, আপনি যে দ্রব্য ও গুণ লইয়া বিবাদ করিতেছেন, তাহার বাস্তবিক ভিত্তিই নাই; দ্রব্য যদি গুণরহিত হয়, তবে একটি মাত্র দ্রব্যের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়। যদি আপনি আত্মা হইতে গুণরাশি তুলিয়া লইয়া দেখাইতে পারেন যে, গুণরাশির অস্তিত্ব কেবল মনে – উহারা প্রকৃতপক্ষে আত্মায় আরোপিত, তাহা হইলে তো দুইটি আত্মারও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ গুণই এক আত্মা হইতে অপর আত্মার পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। এক আত্মা যে অপর আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা আপনি কিভাবে জানিতে পারেন? – কতকগুলি প্রভেদকারী চিহ্ন দ্বারা, কতকগুলি গুণের দ্বারা। আর যেখানে গুণের সত্তা নাই, সেখানে পার্থক্য কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব দুই আত্মা নাই, এক আত্মাই বিদ্যমান; আর পরমাত্মা স্বীকার করা অনাবশ্যক, আপনার এই আত্মাই সেই পরমাত্মা। সেই এক আত্মাকেই পরমাত্মা বলে, তাঁহাকেই জীবাত্মা এবং অন্যান্য নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আর হে সাংখ্যবাদী ও অন্যান্য দ্বৈতবাদিগণ, আপনারা বলিয়া থাকেন, আত্মা সর্বব্যাপী বিভু, অথচ আপনারা কিরূপে বহু আত্মা স্বীকার করেন? অনন্ত কি কখন দুইটি হইতে পারে? অনন্ত সত্তা একটিমাত্র হওয়াই সম্ভব। একমাত্র অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, আর সব তাঁহারই প্রকাশ।

বৌদ্ধ এই উত্তরে নীরব, কিন্তু অদ্বৈতবাদী শুধু বৌদ্ধকে নিরস্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। দুর্বল মতবাদসমূহের ন্যায় কেবল অপর মতের সমালোচনা করিয়াই অদ্বৈতবাদী নিরস্ত নহেন। অদ্বৈতবাদী তখনই অন্যান্য মতাবলম্বীদের সমালোচনা করেন, যখন খুব কাছে আসিয়া তাহারা অদ্বৈতমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহাদিগকে দূরে

সরাইয়া দেন, এই পর্যন্তই তাঁহার অন্যান্য মতাবলম্বীদের বাদখণ্ডন। তারপর তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। একমাত্র অদ্বৈতবাদই শুধু পরমত খণ্ডন করিয়া এবং তজ্জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিরস্ত থাকে না। অদ্বৈতবাদীর যুক্তি এইরূপ – তিনি বলেন তুমি বলিতেছ – জগৎ একটি অবিরাম গতিপ্রবাহমাত্র। ভাল, ব্যাষ্টিতে সবই গতিশীল বটে। তোমারও গতি আছে; এই টেবিলটি – ইহারও প্রতিনিয়ত গতি বা পরিবর্তন হইতেছে। গতি সর্বত্রই, তাই ইহার নাম সংসার; 'সৃ' ধাতুর অর্থ গমন, তাই ইহার নাম জগৎ – অবিরাম গতি। তাই যদি হইল, তাহা হইলে তো এই জগতে 'ব্যক্তিত্ব' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; কারণ ব্যক্তিত্ব বলিতে অপরিণামী কিছু বুঝায়। 'পরিণামশীল ব্যক্তিত্ব' হইতে পারে না, এই বাক্যটি স্ববিরোধী, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই। চিন্তা ভাব, মন শরীর, জীব জন্তু – সকলেরই অহরহঃ পরিণাম হইতেছে। যাহা হউক, এখন সমগ্র জগৎকে একটি সমষ্টিরূপে ধরুন। সমষ্টিরূপে কি এই জগতের পরিণাম বা গতি হইতে পারে? কখনই নহে। কোন অল্প গতিশীল অথবা সম্পূর্ণ গতিহীন বস্তুর সহিত তুলনা করিয়াই গতির ধারণা সম্ভব। অতএব সমষ্টি রূপে জগৎ গতিহীন পরিণামহীন। সুতরাং তখনই – কেবল তখনই আপনার প্রকৃত ব্যক্তিত্ত্ব সম্ভব, যখন আপনি নিজেকে সমগ্র জগতের সহিত অভিন্নভাবে জানিতে পারেন। এই কারণেই বেদান্তী- অদ্বৈতবাদী বলেন: যতদিন দ্বৈত, ততদিন ভয় দূর হইবার উপায় নাই; মানুষ যখন অপর বলিয়া কিছু দেখে না, অপর বলিয়া কিছু অনুভব করে না, যখন একমাত্র সত্তা থাকে, তখনই তাহার ভয় দূর হয়; তখনই মানুষ মৃত্যুর পারে, সংসারের পারে যাইতে পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে শিক্ষা দেয় – সমষ্টিজ্ঞানেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব, ব্যাষ্টিজ্ঞানে নহে। যখন আপনি নিজেকে সমগ্র জগৎ- রূপে অনুভব করিতে পারিবেন, তখনই আপনার প্রকৃত অমৃতত্ত্ব লাভ হইবে। তখনই আপনি ভয়শূন্য ও অমৃতস্বরূপ হইবেন, যখন নিজেকে সমগ্র জগৎ- রূপে জানিবেন, আর তখনই আপনার সহিত জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদবোধ হইবে। এখন অখণ্ড সত্তাকেই আমাদের মতো মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই চন্দ্রসূর্যতারকাদি- সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড- রূপে দেখিয়া থাকে। যাহারা আর একটু ভাল কাজ করে এবং সেই সৎকর্মবলে অন্যপ্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়, তাহারা মৃত্যুর পর ইহাকেই ইন্দ্রাদিদেব- সমন্বিত স্বর্গাদিলোক- রূপে দর্শন করে। যাঁহারা আরও উন্নত, তাঁহারা সেই এক বস্তুকেই ব্রহ্মলোক- রূপে দেখেন, এবং যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবী স্বর্গ বা অন্য কোন লোক কিছুই দেখেন না, তাঁহাদের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়, তাহার পরিবর্তে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন।

আমরা কি এই ব্রহ্মকে জানিতে পারি? সংহিতায় অনন্তের বর্ণনার কথা আমি আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে তাহার ঠিক বিপরীত – এখানে অন্তর্জগতের অনন্তজ্ঞানের চেষ্টা। সংহিতায় বহির্জগতের অনন্ত বর্ণনা; এখানে চিন্তাজগতের, ভাবজগতের অনন্ত বর্ণনা। সংহিতায় অস্তিভাবদ্যোতক ভাষায় অনন্তকে বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; এখানে সে- ভাষায় কুলাইল না, নাস্তি ভাবের ভাষায় অনন্তের বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইল। এই ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। স্বীকার করিলাম ইহা ব্রহ্ম। আমরা কি ইহা জানিতে পারি? না, না। আপনাদিগকে আবার এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ আপনাদের মনে এই সন্দেহ আসিবে – যদি ইহা ব্রহ্ম হয়, তবে আমরা কিরূপে উহাকে জানিতে পারি? 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?'[১৭] – বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবেন? চক্ষু সকল বস্তু দেখিয়া থাকে – চক্ষু কি নিজেকে দেখিতে পায়? পায় না, কারণ জ্ঞানক্রিয়াটিই একটি নিম্ন অবস্থা।

হে আর্যসন্তানগণ, আপনাদিগকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে, কারণ এই তত্ত্বটির ভিতর অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। আপনাদের নিকট যে- সকল পাশ্চাত্যদেশীয় প্রলোভন আসিয়া থাকে, সেগুলির একমাত্র দার্শনিক ভিত্তি এই যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই। প্রাচ্যদেশের কিন্তু অন্য ভাব। আমাদের বেদ বলিতেছেন: বস্তুজ্ঞান বস্তু হইতে নিম্নস্থানীয়, কারণ জ্ঞান- অর্থে সর্বদাই একটা সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিতে হইবে।

---

[১৭] বৃহদারণ্যক উপ, ২।৪।১৪

যখনই আপনি কোন বস্তুকে জানিতে চান, তখনই উহা আপনার মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্বকথিত দৃষ্টান্তে যে ভাবে শুক্তি হইতে মুক্তা নির্মিত হয়, বলা হইয়াছে – সেই কথা চিন্তা করুন, তাহা হইলে বুঝিবেন জ্ঞান- অর্থে সীমাবদ্ধ করা কিরূপ। একটি বস্তুকে আহরণ করিয়া আপনার চেতনায় আনিলে তাহার সমগ্র ভাবটি জানিতে পারিবেন না। সকল জ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। তাই যদি হয়, জ্ঞান- অর্থে যদি সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে অনন্তের জ্ঞান সম্বন্ধে কি উহা কম প্রযোজ্য? যিনি সকল জ্ঞানের স্বরূপ, যাঁহাকে ছাড়িয়া আপনি কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না, যাঁহার কোন গুণ নাই, যিনি সমগ্র জগতের এবং আমাদের অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ, আপনি কি তাঁহাকে এইভাবে সীমাবদ্ধ করিতে পারেন? তাঁহাকে আপনি কিরূপে জানিবেন? কি উপায়ে তাঁহাকে বাঁধিবেন?

সব কিছু –এ ই জগৎপ্রপঞ্চ এইরূপ বাঁধিবার বৃথা চেষ্টা। এই অনন্ত আত্মা যেন নিজের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন, নিম্নতম প্রাণী হইতে উচ্চতম দেবতা পর্যন্ত সব যেন তাঁহার মুখ প্রতিবিম্বিত করিবার দর্পণ; আরও কত আধার তিনি গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু কোনটিই পর্যাপ্ত নয়, অবশেষে মনুষ্যদেহে তিনি বুঝিতে পারেন যে, এ- সবই সসীম – অনন্ত কখন সান্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না।

তারপর শুরু হয় প্রত্যাবর্তন এবং ইহাই ত্যাগ বা বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হও, ইন্দ্রিয়ের অভিমুখে যাইও না – ইহাই বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র। ইহাই সর্বপ্রকার নীতির মূলমন্ত্র, ইহাই সর্বপ্রকার কল্যাণের মূলমন্ত্র, কারণ আপনাদিগকে অবশ্য মনে রাখিতে হইবে তপস্যাতেই জগতের সৃষ্টি – ত্যাগেই জগতের উৎপত্তি। আর যতই আপনি ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিবেন, ততই আপনার সম্মুখে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন দেহ প্রকাশিত হইতে থাকিবে, এক এক করিয়া সেগুলি পরিত্যক্ত হইবে, অবশেষে আপনি স্বরূপতঃ যাহা, তাহাই থাকিবেন। ইহাই মোক্ষ।

এই তত্ত্বটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে – 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' – বিজ্ঞাতাকে কি করিয়া জানিবে? জ্ঞাতাকে কখন জানিতে পারা যায় না, কারণ যদি তাঁহাকে জানা যাইত, তাহা হইলে তিনি আর জ্ঞাতা থাকিতেন না। দর্পণে যদি আপনার চক্ষুর প্রতিবিম্ব দেখেন, তাহাকে আপনি কখন চক্ষু বলিতে পারেন না; তাহা অন্য কিছু, তাহা প্রতিবিম্বমাত্র। এখন কথা এই, যদি এই আত্মা – এই অনন্ত সর্বব্যাপী পুরুষ সাক্ষিমাত্র হইলেন, তাহা হইলে আর কি হইল? ইহা তো আমাদের মতো চলিতে ফিরিতে, জীবনধারণ করিতে এবং জগৎকে সম্ভোগ করিতে পারে না; সাক্ষিস্বরূপ যে কিরূপে আনন্দসম্ভোগ করিতে পারে, লোকে সে- কথা বুঝিতে পারে না। 'ওহে হিন্দুগণ, তোমরা সব সাক্ষিস্বরূপ, – এই মতবাদের দ্বারাই তোমরা নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ' – এই কথাই লোকে বলিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তর এই – যিনি সাক্ষিস্বরূপ তিনিই প্রকৃতপক্ষে আনন্দসম্ভোগ করিতে পারেন। কোন স্থানে যদি একটা কুস্তি হয়, তাহা হইলে ঐ কুস্তির আনন্দভোগ বেশী করে কাহারা? – যাহারা কুস্তি করিতেছে তাহারা, না দর্শকেরা? এই জীবনে যতই আপনি কোন বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপ হইতে পারিবেন, ততই আপনি অধিক আনন্দ ভোগ করিবেন। ইহাই প্রকৃত আনন্দ; আর এই কারণে তখনই আপনার অনন্ত আনন্দ সম্ভব, যখন আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ হয়েন। তখনই আপনি মুক্তপুরুষপদবাচ্য। যে সাক্ষিস্বরূপ, সে- ই স্বর্গে যাইবার বাসনা না রাখিয়া, নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান হইয়া নিষ্কামভাবে কাজ করিতে পারে। যে সাক্ষিস্বরূপ সে- ই আনন্দ ভোগ করিতে পারে, অন্য কেহ নহে।

অদ্বৈতবাদের নৈতিক দিক আলোচনা করিতে যাইয়া দার্শনিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আর একটি বিষয় আসিয়া থাকে – উহা মায়াবাদ। অদ্বৈতবাদের অন্তর্গত এক একটি বিষয় বুঝিতেই বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়, বুঝাইতে, আবার আরও বিলম্ব লাগে। অতএব আমাকে ইহার সামান্য কিছু উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে। এই মায়াবাদ বুঝা চিরকালই একটি কঠিন ব্যাপার। মোটামুটি আমি আপনাদিগকে বলিতেছি যে, মায়াবাদ প্রকৃতপক্ষে বাদ বা মত বিশেষ নহে, মায়া দেশকালনিমিত্তের নাম – আরও সংক্ষেপে উহাকে 'নামরূপ' বলে। সমুদ্র হইতে সমুদ্রের তরঙ্গের প্রভেদ কেবল নামে ও রূপে, আর তরঙ্গ হইতে এই নামরূপের কোন পৃথক্ সত্তা

নাই, নামরূপ তরঙ্গের সহিতই বর্তমান। তরঙ্গ অন্তর্হিত হইতে পারে, তরঙ্গের অন্তর্গত নামরূপ যদি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায় তথাপি সেই একই পরিমাণ জল থাকিয়া যাইবে। অতএব এই মায়াই আপনার আমার মধ্যে, জীবজন্তু ও মানবের মধ্যে, দেবতা ও মানবের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই মায়াই যেন আত্মাকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে, আর এই মায়া নামরূপ ব্যাতীত আর কিছুই নাহে। যদি ঐগুলিকে পরিত্যাগ করেন – নাম- রূপ দূর করিয়া দেন, তবেই এসব পার্থক্য চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে, তখন আপনি প্রকৃত পক্ষে যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। ইহাই মায়া। মায়া কোন মতবাদ নহে, উহা জগতের ঘটনাবলীর বর্ণনামাত্র।

বাস্তববাদিগণ বলেন, এই জগতের অস্তিত্ব আছে। সেই বেচারারা অজ্ঞ, বালকবৎ; তাঁহারা যে জগৎ সত্য বলেন, তাহা এই অর্থে বলেন যে এই টেবিলটি বা অন্যান্য বস্তুর নিরপেক্ষ সত্তা আছে, উহাদের অস্তিত্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপর কোন বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না, আর যদি এই সমগ্র জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি উহা বা অন্যান্য বস্তু যেমন রহিয়াছে, ঠিক তেমনই থাকিবে। একটু সামান্য জ্ঞানলাভ করিলেই তিনি বুঝিবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের সব কিছুই পরস্পরের উপর নির্ভর করে, উহারা আপেক্ষিক। আমাদের বস্তুজ্ঞানের তিনটি সোপান আছে: প্রথম – প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, পরস্পর পৃথক; দ্বিতীয় সোপান – সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান; আর শেষ সোপান – একটি মাত্র বস্তু আছে, তাহাকেই আমরা নানারূপে দেখিতেছি।

অজ্ঞ ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা এই যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোথাও রহিয়াছেন, অর্থাৎ তখন ঈশ্বরধারণা খুব মানবভাবাপন্ন – মানুষ যাহা করে, তিনিও তাহাই করেন তবে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী রকমে করেন। আর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এরূপ ঈশ্বরকে অল্প কথায় কিরূপে অযৌক্তিক ও অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ধারণা এই যে, একটি শক্তি রহিয়াছে, সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশ। ইনিই প্রকৃত সগুণ ঈশ্বর, চণ্ডীতে ইঁহার কথা লিখিত আছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবেন যে, এই ঈশ্বর কেবল কল্যাণকর গুণরাশির আধার নহেন। ঈশ্বর ও শয়তান – দুইটি 'দেবতা' থাকিতে পারে না। এক ঈশ্বরের অস্বিত্বই স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাকে ভরসা করিয়া ভালমন্দ উভয়ই বলিতে হইবে এবং ঐ যুক্তিসঙ্গত মত স্বীকার করিলে তাহা হইতে যে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে।

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ॥[১৮]

–যিনি সর্বভূতে শান্তি ও ভ্রান্তিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি। যাহা হউক, তাঁহাকে শুধু শান্তিস্বরূপ বলিলে চলিবে না, তাঁহাকে সর্বস্বরূপ বলিলে তাহার ফল যাহাই হউক, তাহা লইতে হইবে।

'হে গার্গি, এ জগতে যাহা কিছু আনন্দ দেখিতে পাও, সবই তাঁহার অংশমাত্র।' আপনি উহাকে যেমন ইচ্ছা কাজে লাগাইতে পারেন। আমার সম্মুখবর্তী এই আলোকের সাহায্যে আপনি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে একশত টাকা দিতে পারেন, আর একজন লোক আপনার নাম জাল করিতে পারে, কিন্তু আলোক উভয়ের পক্ষেই সমান। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান।

তৃতীয় সোপান এই যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরেও নাই, ভিতরেও নাই, কিন্তু ঈশ্বর, প্রকৃতি, আত্মা, জগৎ – এইগুলি একপর্যায়ভুক্ত শব্দ। প্রকৃতপক্ষে দুইটি বস্তু নাই, কতকগুলি দার্শনিক শব্দই আপনাকে প্রতারিত

[১৮] চণ্ডী, ৫ম অধ্যায়

করিয়াছে। আপনি কল্পনা করিতেছেন, আপনি শরীর – আবার আত্মা, আপনি একই সঙ্গে এই শরীর ও আত্মা হইয়া রহিয়াছেন। তাহা কিভাবে হইতে পারে? নিজের মনের ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখুন। যদি আপনাদের মধ্যে কেহ যোগী থাকেন, তিনি নিজেকে চৈতন্য স্বরূপ জ্ঞান করিবেন, তাঁহার পক্ষে শরীর বোধ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যদি আপনি সাধারণ লোক হন, তবে নিজেকে দেহ বিবেচনা করিবেন, তখন চৈতন্যের জ্ঞান একেবারে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু মানুষের দেহ আছে, আত্মা আছে, আরও অন্যান্য জিনিষ আছে – এই সকল দার্শনিক ধারণা থাকাতে তাহার মনে হয়, এগুলি একই সময়ে রহিয়াছে। এক কালে একটি বস্তুরই ধারণা হয়। যখন আপনি জড়বস্তু দেখিতেছেন, তখন ঈশ্বরের কথা বলিবেন না। আপনি কেবল কার্যই দেখিতেছেন, কারণকে আপনি দেখিতে পাইতেছেন না। আর যে–মূহুর্তে আপনি কারণকে দেখিবেন, সে- মূহুর্তে কার্য অন্তর্হিত হইবে। এ জগৎ কোথায় গেল? কে ইহাকে গ্রাস করিল?

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং
সমরসমসমানং মানসং বন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥
আজরমমরমস্তাভাসবস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশিরপ্রখ্যামাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥[১৯]

– জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি- অবস্থায় অনির্বচনীয়, কেবল আনন্দস্বরূপ, উপমারহিত, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম আকাশতুল্য, অংশহীন ও ভেদশূন্য পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি- অবস্থায় প্রকৃতির বিকারহীন অচিন্ত্যতত্ত্বস্বরূপ, সমভাবাপন্ন অথচ যাঁহার সমান কেহ নাই, যাঁহাতে কোনরূপ পরিমাণের সম্বন্ধ নাই – যিনি অপরিমেয়, যিনি বেদবাক্যেরর দ্বারা সিদ্ধ এবং সর্বদা আমাদের – ব্রহ্মতত্ত্ব- অভ্যাসশীলগণের নিকট প্রসিদ্ধ – এইরূপ পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি- অবস্থায় জরামৃত্যুশূন্য, যিনি বস্তুস্বরূপ এবং যাঁহাতে কিছুই অভাব নাই, স্থিরজলরাশি- সদৃশ নামরহিত, সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ গুণবিকাররহিত, ক্ষয়হীন, শান্ত, এক পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন। – মানবের এমন অবস্থাও আসিয়া থাকে, তখন তাহার পক্ষে জগৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি, এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় – অবশ্য অজ্ঞেয় বাদীর অর্থে উহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নহে; তাহাকে জানিয়াছি, বলিলেই তাঁহাকে ছোট করা হইল, কারণ পূর্ব হইতেই আপনি সেই ব্রহ্ম। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এই ব্রহ্ম এক হিসাবে এই টেবিল নহেন, আবার অন্য হিসাবে ব্রহ্ম ঐ টেবিলেও বটে। নামরূপ তুলিয়া লউন, তাহা হইলেই যে সত্যবস্তু থাকিবে, তাহাই তিনি। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর ভিতর সত্যস্বরূপ।

---

[১৯] বিবেকচূড়ামণি, ৪০৮- ৪১০।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ [২০]

—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ – দণ্ডহস্তে ভ্রমণ করিতেছ, তুমিই জাত হইয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছ।

তুমি সকল বস্তুতে বর্তমান রহিয়াছ, আমিই তুমি, তুমিই আমি – ইহাই অদ্বৈতবাদের কথা। এ সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিব। এই অদ্বৈতবাদেই সকল বস্তুর মূলতত্ত্বের রহস্য নিহিত। আমরা দেখিয়াছি, এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই কেবল আমরা যুক্তিতর্ক ও বিজ্ঞানের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারি। এখানেই অবশেষ যুক্তিবিচার একটি দৃঢ় ভিত্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু ভারতীয় বৈদান্তিক কখনও তাঁহার সিদ্ধান্তের পূর্ববর্তী সোপানগুলির উপর দোষারোপ করেন না, তিনি নিজ সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া পিছনের দিকে তাকান এবং ঐগুলিকে আর্শীবাদ করেন; তিনি জানেন সেগুলি সত্য, কেবল একটু ভুলক্রমে অনুভূত ও ভুলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একই সত্য – কেবল মায়ার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট; হইতে পারে কিঞ্চিৎ বিকৃত চিত্র, তাহা হইলেও উহা সত্য, সত্য ব্যাতীত মিথ্যা কখনই নহে। সেই এক ব্রহ্ম, যাঁহাকে অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতির বহির্দেশে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, যাঁহাকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তি জগতের অন্তর্যামিরূপে দেখেন, যাঁহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের আত্মরূপে ও সমগ্র বিশ্বরূপে অনুভব করেন; এ-সকল একই বস্তু, একই বস্তু বিভিন্ন ভাবে দৃষ্ট, মায়ার বিভিন্ন কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্ট, বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট; আর বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট বলিয়াই এই সব বিভিন্নতা। শুধু তাহাই নহে, উহাদের মধ্যে একটি আর একটিতে যাইবার সোপান। বিজ্ঞানও সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি? অন্ধকারে রাস্তায় গিয়া যদি কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটিতে দেখেন, একজন পথচারীকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করুন; দশ জনের মধ্যে অন্ততঃ নয় জন বলিবে, ভূতে এ ব্যাপার করিতেছি; সে সর্বদাই ভূত দেখিতেছে, কারণ অজ্ঞানের স্বভাব কার্যের বাহিরে কারণের অনুসন্ধান করা। একটা ঢিল পড়িলে সে বলে, ভূত বা দৈত্য উহা ফেলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বলে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম – মাধ্যাকর্ষণ।

সর্বত্রই বিজ্ঞান ও ধর্মে কি বিরোধ? প্রচলিত ধর্মগুলি বহির্মুখী ব্যাখ্যায় এতদূর জড়িত যে, সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইরূপ অনন্ত দেবতার কল্পনা করে, আর ভাবে, যাহা কিছু ঘটিতেছে সবই একটা না একটা দেবতা বা ভূত করিতেছে। ইহার মোট কথাটা এই যে, ধর্ম – কোন কিছুর কারণ সেই বস্তুর বাহিরে অন্বেষণ করে, আর বিজ্ঞান তাহার কারণ সেই বস্তুর ভিতরেই অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান যত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, ততই উহা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা ভূত-প্রেতের হাত হইতে নিজের হাতে লইতেছে। যেহেতু ধর্মরাজ্যে অদ্বৈতবাদ এই কাজ করিয়াছে, সেই হেতু অদ্বৈতবাদই অধিকতরভাবে বৈজ্ঞানিক ধর্ম। এই জগদব্রহ্মাণ্ড বাহিরের কোন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, জগতের বহির্দেশে অবস্থিত কোন দৈত্য তাহা সৃষ্টি করে নাই, ইহা আপনা আপনি সৃষ্ট হইতেছে, আপনা আপনি উহার প্রকাশ হইতেছে, আপনা আপনি উহার প্রলয় হইতেছে, উহা এক অনন্ত সত্বা ব্রহ্ম 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' [২১] – হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই। এইরূপে আপনারা দেখিতেছেন, অদ্বৈতবাদই একমাত্র বৈজ্ঞানিক ধর্ম – অন্য কোন মতবাদ নয়; আর বর্তমান অর্ধশিক্ষিত ভারতে আজকাল প্রত্যহ যে বিজ্ঞানের বুক্‌নি চলিতেছে, প্রত্যহ যে যুক্তির দোহাই শুনিতেছি, তাহাতে আমি আশা করি, আপনারা দলকে দল অদ্বৈতবাদী হইবেন, আর বুদ্ধের কথায় বলিতেছি, 'বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়' জগতে উহা প্রচার করিতে সাহসী হইবেন। যদি তাহা না পারেন, তবে আপনাদিগকে কাপুরুষ মনে করিব।

[২০] শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৪।৩
[২১] ছান্দোগ্য, ৬।৮৭

যদি আপনার এইরূপ দুর্বলতা থাকে, যদি আপনি একেবারে প্রকৃত সত্য স্বীকার করিতে ভয় পান বলিয়া উহা অবলম্বন করিতে না পারেন, তবে অপরকেও সেইরূপ স্বাধীনতা দিন, বেচারা মূর্তিপূজককে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন না; যাহার সহিত আপনার মত সম্পূর্ণ না মিলে, তাহার নিকট আপনার মত প্রচার করিতে যাইবেন না। প্রথমে এইটি বুঝা যে, আপনি নিজে দুর্বল, আর যদি সমাজের ভয় পান, যদি আপনার নিজ প্রাচীন কুসংস্কারের দরুণ ভয় পান, তবে আপনি বুঝিয়া দেখুন যাহারা অজ্ঞ, তাহারা এই কুসংস্কারে আরও কত ভয় পাইবে, ঐ কুসংস্কার তাহাদিগকে আরও কতদূর বদ্ধ করিবে। ইহাই অদ্বৈতবাদের কথা। অন্যের উপর সদয় হউন। ঈশ্বরেচ্ছায় কালই যদি সমগ্র জগৎ – শুধু মতে নয়, অনুভূতিতেও অদ্বৈতবাদী হয়, তাহা হইলে তো খুব ভালই হয়; কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে যতটা ভাল করিতে পারা যায়, তাই করুন, সকলের হাত ধরিয়া তাহাদের সামর্থ্যানুসারে ধীরে ধীরে লইয়া যান; আর জানিবেন যে, ভারতে সকল প্রকার ধর্মের বিকাশই ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির নিয়ামানুসারে হইয়াছে। মন্দ হইতে ভাল হইতেছে, তাহা নহে; ভাল হইতে আরও ভাল হইতেছে।

অদ্বৈতবাদের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের যুবকেরা আজকাল অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা কাহারও কাছে শুনিয়াছেন – ঈশ্বর জানেন কাহার কাছে – অদ্বৈতবাদের দ্বারা সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে, কারণ অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয় – আমরা সকলেই এক, সকলেই ঈশ্বর; অতএব আমাদের আর নীতিপরায়ণ হইবার প্রয়োজন নাই। এ- কথার উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয় যে, এ- যুক্তি পশুপ্রকৃতি ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়, কশাঘাত ব্যাতীত যাহাকে দমন করিবার অন্য উপায় নাই। যদি আপনি পশুপ্রকৃতি হন, তবে শুধু কশাঘাতে শাসন যোগ্য মনুষ্য পদবাচ্য হইয়া থাকা অপেক্ষা আপনার পক্ষে বরং আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ। কশাঘাত বন্ধ করিলেই আপনারা সকলে অসুর হইয়া দাঁড়াইবেন। তাই যদি হয়, তবে আপনাদের এখনই মারিয়া ফেলা উচিত – আপনাদের ভাল করিবার আর উপায় নাই। চিরকালই তাহা হইলে আপনাদিগকে এই কশা ও দণ্ডের ভয়ে চলিতে হইবে, আপনাদের আর উদ্ধার নাই, আপনাদের আর পলায়নের পন্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈতবাদ – কেবল অদ্বৈতবাদের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার – অন্যের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব? সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে – নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব? – কারণ কোন দেবতা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। দেবতার কথায় আমার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে ইহা বলিয়া গিয়াছে; শাস্ত্রে বলুক না আমি উহা আমি মানিতে যাইব কেন? আর ধরুন, কতকগুলি লোক ঐ শাস্ত্র বা ঈশ্বরের দোহাই শুনিয়া নীতিপরায়ণ হইল – তাহাতেই বা কি! জগতের অধিকাংশ লোকের নীতি – ‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা’; তাই বলিতেছি – আমি যে নীতিপরায়ণ হইব, ইহার যুক্তি দেখান। অদ্বৈতবাদ ব্যাতীত ইহা ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মানাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ [২২]

–অর্থাৎ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া সেই সমদর্শী নিজে নিজেকে হিংসা করে না। সেই জন্য তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।

অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হউন যে, অপরকে হিংসা করিতে গিয়া আপনি নিজেকেই হিংসা করিতেছেন – কারণ তাহারা সকলেই যে আপনি! আপনি জানুন আর নাই জানুন, সকল হাত দিয়া আপনি কাজ করিতেছেন, সকল পা দিয়া আপনি চলিতেছেন, আপনিই রাজারূপে প্রাসাদে সুখভোগ করিতেছেন, আবার আপনিই রাস্তার ভিখারীরূপে দুঃখের জীবন যাপন করিতেছেন। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও আপনি, বিদ্বানেও আপনি, দুর্বলেও মধ্যেও আপনি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হউন। যেহেতু অপরকে হিংসা

[২২] গীতা, ১৩।২৮

করিলে নিজেকে হিংসা করা হয় সে জন্য কখনও অন্যকে হিংসা করা উচিত নহে। সেইজন্যই যদি আমি না খাইয়া মরিয়া যাই, তাহাও আমি গ্রাহ্য করিনা, কারণ আমি যখন শুকাইয়া মরিতেছি, তখন আমার লক্ষ লক্ষ মুখে আমিই আহার করিতেছি। অতএব এই ক্ষুদ্র 'আমি আমার' সম্পর্কীয় বিষয় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা উচিত নয়, কারণ সমগ্র জগতই আমার, আমি যুগপৎ জগতের সকল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। আমাকে ও জগৎকে কে বিনাশ করিতে পারে? কাজেই দেখিতেছেন, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের এমমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্য। অন্যান্য মতবাদ আপনাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, ইহার কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, এই পর্যন্ত দেখা গেল – একমাত্র অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

অদ্বৈতবাদ-সাধনে লাভ কি? উহাতে শক্তি তেজ বীর্যলাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন, 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'[২৩] – প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। সমগ্র জগতে আপনারা যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা সরাইয়া লইতে হইবে। মানুষকে দুর্বল ভাবিবেন না, তাহাকে দুর্বল বলিবেন না। জানিবেন, সকল পাপ ও সকল অশুভ এক 'দুর্বলতা' শব্দ দ্বারাই নির্দিষ্ট হইতে পারে। সকল অসৎকার্যের মূল – দুর্বলতা। দুর্বলতার জন্যই যাহা করা উচিত নয়, মানুষ তাহাই করিয়া থাকে; দুর্বলতার জন্যই মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। তাহারা কি, এ তত্ত্ব তাহারা সকলেই জানুক। দিবারাত্র তাহারা নিজেদের স্বরূপের কথা বলুক। 'আমিই সেই' – এই ওজস্বী ভাবধারা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তাহারা পান করুক। তার পর তাহারা পান করুক। তার পর তাহারা উহা চিন্তা করুক; ঐ চিন্তা – ঐ মনন হইতে এমন সব কাজ হইবে, যাহা পৃথিবী কখনও দেখে নাই।

কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন – এই অদ্বৈতবাদ কার্যকর নয়, অর্থাৎ জড়-জগতে এখনও উহার শক্তি প্রকাশিত হয় নাই। এই কথা আংশিক সত্য বটে। বেদের সেই বাণী স্মরণ করুন:

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষ্যরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥[২৪]

–ওঁ, ইহা মহারহস্য। ওঁ – ইহা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। যিনি এই ওঙ্কারের রহস্য জানেন, তিনি যাহা চান, তাহাই পাইয়া থাকেন।

অতএব প্রথমে এই ওঙ্কারের রহস্য অবগত হউন – আপনিই যে সেই ওঙ্কার, তাহা জানুন। এই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের রহস্য অবগত হউন; তখনই – কেবল তখনই আপনারা যাহা চাহিবেন, তাহা পাইবেন। যদি জড়জগতে বড় হইতে চান, তবে বিশ্বাস করুন – আপনি বড়। আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, আপনি হয়তো পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিবেন আমাদের উভয়েরই পিছনে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডার স্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখানে হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস করুন। অদ্বৈতবাদের রহস্য এই যে, প্রথমে নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তারপর অন্য কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়। জগতের ইতিহাসে দেখিবেন, যে-সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, শুধু তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান্ হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবেন, যে-সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান্ হইয়াছে। এই ভারতে একজন ইংরেজ আসিয়াছিলেন – তিনি সামান্য কেরানী ছিলেন; পয়সা-কড়ির অভাবে ও অন্যান্য কারণে তিনি দুইবার নিজের মাথায় গুলি করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, এবং যখন তিনি উহাতে

---

[২৩] বৃহ উপ., ২।৪।৫
[২৪] কঠ উপ, ১।২।১৬

অকৃতকার্য হইলেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল – তিনি কোন বড় কাজ করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন; সেই ব্যক্তিই ব্রিটিশ সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ। যদি তিনি পাদরীদের উপর বিশ্বাস করিয়া সারাজীবন হাঁটু গাড়িয়া বলিতেন, 'হে প্রভু, আমি দুর্বল, আমি হীন', তবে তাঁহার কি গতি হইত? নিশ্চয় উন্মাদাগারেই তাঁহার স্থান হইত। লোকে এই-সকল কুশিক্ষা দিয়া আপনাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আমি সমগ্র পৃথিবীতে দেখিয়াছি, দীনতা ও দুর্বলতার উপদেশ দ্বারা অতি অশুভ ফল ফলিয়াছে, ইহা মনুষ্যজাতিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে এইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয় – এবং ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহারা শেষে আধপাগল গোছের হইয়া দাঁড়ায়?

অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করিবার উপায় – নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করুন; টাকা আপনার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা করেন, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ করুন, আপনি মহামনীষী হইবেন। যদি আপনি মুক্তিলাভ করিতে চান, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে – তাহা হইলে আপনি মুক্ত হইয়া যাইবেন, পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবেন। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন অদ্বৈতবাদ কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল – অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে রহস্য বা গোপনীয় বিদ্যা করিয়া রাখিলে চলিবে না, এখন আর উহা হিমালয়ের গুহায় বন জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট আবদ্ধ থকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটিরে, সর্বত্র – এমন কি রাস্তার ভিখারী দ্বারাও উহা কার্যে পরিণত হইতে পরে।

গীতায় কি উক্ত হয় নাই – 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ?' – এই ধর্মের অল্পমাত্রও আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব আপনি স্ত্রী হন বা শূদ্রই হন, বা আর যাহা কিছু হন – আপনার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই ধর্ম এতই বড় যে, ইহার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও মহৎ কল্যাণ হইয়া থাকে। অতএব হে আর্যসন্তানগণ, অলসভাবে বসিয়া থাকিবেন না – উঠুন, জাগুন, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছেন, ততদিন নিশ্চিত থাকিবেন না। এখন অদ্বৈতবাদকে কার্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে – উহাকে এখন স্বর্গ হইতে মর্ত্যে লইয়া আসিতে হইবে, ইহাই এখন বিধির বিধান। আমাদের পূর্বপুরুষগণের বাণী আমাদিগকে অবনতির দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। অতএব হে আর্যসন্তানগণ, আর সে-দিকে অগ্রসর হইবেন না। আপনাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ – উচ্চ স্তর হইতে ক্রমশঃ নিম্নে অবতরণ করিয়া সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করুক, সমাজের প্রতি স্তরে প্রবেশ করুক, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক, আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া প্রতি শোণিতবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হউক।

আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অপেক্ষা মার্কিনরা বেদান্তকে অধিক পরিমাণে কর্মজীবনে পরিণত করিয়াছে। আমি নিউ ইউর্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম – বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় বাস করিবার জন্য আসিতেছে। দেখিলে বোধ হইত যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে – পদদলিত, আশাহীন। এক পুটলি কাপড় কেবল তাহাদের সম্বল – কাপড়গুলিও সব ছিন্নভিন্ন, তাহারা ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিশের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাথের অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা করে। এখন দেখুন, ছয়মাস বাদে সেই লোকগুলিই ভাল জামাকাপড় পরিয়া সোজা হইয়া চলিতেছে – সকলের দিকেই নির্ভীক দৃষ্টিতে চাহিতেছে। এমন অদ্ভুত পরিবর্তন কিভাবে আসিল? মনে করুন, সে ব্যক্তি আর্মেনিয়া বা অন্য কোন স্থান হইতে আসিতেছে – সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না, সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত – 'তুই জন্মেছিস, গোলাম, থাকবি গোলাম, একটু

যদি নড়তে চড়তে চেষ্টা করিস তো তোকে পিষে ফেলব।' চারিদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, 'গোলাম তুই, গোলাম আছিস – যা আছিস তাই থাক।' সেখানকার হাওয়া যেন তাহাকে গুণগুণ করিয়া বলিত, 'তোর কোন আশা নাই – গোলাম হইয়া চিরজীবন নৈরাশ্যের অন্ধকারে পড়িয়া থাক্।'' সেখানে বলবান ব্যক্তি তাহাকে পিষিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইতেছিল। আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউ ইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল একজন ভাল পোশাক পরা ভদ্রলোক তাহার করমর্দন করিল। সে যে ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত, আর একটি ভদ্রলোকটি যে উত্তমবস্ত্রধারী, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, ভদ্রলোকেরা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন – সেই টেবিলেরই এক প্রান্তে তাহাকে বসিতে বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, দেখিল – এ এক নূতন জীবন; সে দেখিল – এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ভিতরে সেও একজন মানুষ। হয়তো সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সহিত করমর্দন করিয়া আসিল, সেখানে হয়তো সে দেখিল দূরবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে মলিন বস্ত্রপরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেন্টের করমর্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম-মায়াবশে এইরূপ দুর্বল দাসভাবাপন্ন হইয়াছিল! এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল – মনুষ্যপূর্ণ জগতে সেও একজন মানুষ।

আমাদের এই দেশে – বেদান্তের এই জন্মভূমিতে সাধারণ লোককে শত শতাব্দী যাবৎ এই রূপ মায়াচক্রে ফেলিয়া এমন হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি! তাহাদিগকে বলা হইতেছে, 'নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোদের জন্ম – থাক্ চিরকাল এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে।' ফল এই হইয়াছে যে, সাধারণ লোক ক্রমশঃ ডুবিতেছে, গভীর অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে, মনুষ্যজাতি যতদূর নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছতে পারে, অবশেষ ততদূর পৌঁছিয়াছে। কারণ এমন দেশ আর কোথায় আছে, যেখানে মানুষকে গো-মহিষাদির সঙ্গে একত্র বাস করিতে হয়? আর ইহার জন্য অপর কাহারও ঘাড়ে দোষ চাপাইবেন না – অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে ভুল করিয়া থাকে, সেই ভ্রমে আপনারা পড়িবেন না। ফলও হাতে হাতে দেখিতেছেন, তাহার কারণও এইখানেই বর্তমান। বাস্তবিক দোষ আমাদেরই। সাহস করিয়া দাঁড়ান, নিজেদের ঘাড়েই সব দোষ লউন। অন্যের স্কন্ধে দোষরোপ করিতে যাইবেন না, আপনারা যে-সকল কষ্ট ভোগ করিতেছেন, সেগুলির জন্য আপনারাই দায়ী।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, আপনারা এইটি বিশেষভাবে অবগত হউন যে, আপনাদের স্কন্ধে এই মহাপাপ – বংশপরম্পরাগত এই জাতীয় মহাপাপ রহিয়াছে। ইহা দূর করিতে না পারিলে আপনাদের আর উপায় নাই। আপনারা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পারেন, বিশ হাজার রাজনীতিক সম্মেলন করিতে পারেন, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পারেন; এসবে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না আপনাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে; যতদিন না আপনাদের ভিতর সেই হৃদয় আসিতেছে – যে হৃদয় সকলের জন্য ভাবে। যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা আসিতেছে, যতদিন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী কর্মজীবনে পরিণত করা হইতেছে, ততদিন আমাদের আশা নাই। আপনারা ইওরোপীয়দের এবং তাহাদের সভাসমিতির অনুকরণ করিতেছেন; কিন্তু তাহাদের হৃদয়বত্তার অনুকরণ করিয়াছেন কি? আমি আপনাদিগকে একটি গল্প বলিব – আমি স্বচক্ষে যে ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা আপনাদের নিকট বলিব – তাহা হইলেই আপনারা আমার ভাব বুঝিবেন। একদল ইউরোপীয়ান কতকগুলি ব্রহ্মদেশবাসীকে লণ্ডনে লইয়া গিয়া, তাহাদের একটি প্রদর্শনী করিয়া খুব পয়সা উপার্জন করিল। টাকাকড়ি নিজেরা লইয়া তাহাদিগকে ইওরোপের এক জায়গায় ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। এই গরীব বেচারারা কোন ইওরোপীয় ভাষায় একটি শব্দও জানিত না। যাহা হউক, অষ্ট্রিয়ার ইংরেজ কন্‌সল তাহাদিগকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা লণ্ডনেও কাহাকেও জানিত না, সুতরাং সেখানে গিয়াও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িল। কিন্তু একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা তাহাদের বিষয় জানিতে পারিয়া এই বর্মী বৈদেশিকগণকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া নিজের কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, প্রয়োজনীয় সব দিয়া তাহাদের সেবা

করিতে লাগিলেন এবং সংবাদপত্রে খবরটি পাঠাইয়া দিলেন। দেখুন, তাহার ফল কি হইল! তার পরদিনই যেন সমগ্র জাতিটি জাগিয়া উঠিল, চারিদিক হইতে তাহাদের সাহায্যার্থে টাকা আসিতে লাগিল, শেষে তাহাদিগকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

তাহাদের রাজনীতিক ও অন্যপ্রকার সভাসমিতি যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপ সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা অন্ততঃ তাহাদের স্বজাতিপ্রীতির দৃঢ়ভিত্তি। তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে ভাল না বাসিতে পারে, তাহারা আর সকলের শত্রু হইতে পারে, কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, তাহারা নিজেদের দেশ ও জাতিকে গভীরভাবে ভালবাসে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাহাদের গভীর অনুরাগ এবং তাহাদের দ্বারে সমাগত বৈদেশিকগণের প্রতিও তাহাদের খুব দয়া। পাশ্চাত্য দেশে সর্বত্র তাহারা কিভাবে অতিথি বলিয়া আমার যত্ন লইয়াছিল, এ কথা যদি আমি আপনাদের নিকট বার বার না বলি, তাহা হইলে আমি অকৃতজ্ঞতাদোষে দোষী হইব। এখানে সেই হৃদয় কোথায়, যাহাকে ভিত্তি করিয়া এই জাতির উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা পাঁচজন মিলিয়া একটি ছোটখাটো যৌথ কারবার খুলিলাম, কিছুদিন চলিতে না চলিতে আমরা পরস্পরকে ঠকাইতে লাগিলাম, শেষে সব ভাঙিয়া চূরমার হইয়া গেল। আপনারা ইংরেজ অনুকরণ করিবেন বলেন, আর তাহাদের মতো শক্তিশালী জাতি গঠন করিতে চাহেন, কিন্তু আপনাদের ভিত্তি কোথায়? আমাদের বালির ভিত্তি, তাহার উপর নির্মিত গৃহ অতি শীঘ্রই চুরমার হইয়া ভাঙিয়া যায়।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, আবার সেই বিশাল অদ্বৈতভাবের পতাকা উড্ডীন করুন – কারণ আর কোন ভিত্তির উপর সেই অপূর্ব প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; যতদিন না আপনারা সেই এক ভগবানকে একভাবে সর্বত্র অবস্থিত হইতে দেখিতেছেন, ততদিন আপনাদের ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে পারে না, সেই প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দিন। উঠুন, জাগুন, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছিতেছেন, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিবেন না; উঠুন, আর একবার উঠুন, ত্যাগ ব্যাতীত কিছুই হইতে পারে না। অন্যকে যদি সাহায্য করিতে চান, তবে আপনার নিজের অহংকে বিসর্জন দিতে হইবে। খ্রীষ্টানদের ভাষায় বলি: ঈশ্বর ও শয়তানের সেবা কখনও এক সঙ্গে করিতে পারিবেন না। বৈরাগ্যবান্ হউন – আপনাদের পূর্বপুরুষগণ বড় বড় কাজ করিবার জন্য সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা নিজেদের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। আপনারা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিন, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দিন, যান, অন্যের সাহায্য করুন। আপনারা সর্বদাই বড় বড় কথা বলিতেছেন, কিন্তু আপনাদের সম্মুখে এই কর্মপরিণত বেদান্ত স্থাপন করিলাম। আপনাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হউন। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে আপনি আমি – আমাদের মতো হাজার হাজার লোক যদি অনাহারে মরে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

এই জাতি ডুবিতেছে! লক্ষ লক্ষ লোকের অভিশাপ আমাদের মস্তকে রহিয়াছে – যাহাদিগকে আমরা নিত্য-প্রবাহিত অমৃতনদী পার্শ্বে বহিয়া গেলেও তৃষ্ণার সময় পয়ঃপ্রণালীর জল পান করিতে দিয়াছি, সম্মুখে অপর্যাপ্ত আহার্য থাকা সত্ত্বেও যাহাদিগকে আমরা অনশনে মরিতে দিয়াছি, লক্ষ লক্ষ লোক – যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি, কিন্তু প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি, – যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা 'লোকাচারের' মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা মুখে বলিয়াছি – সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি নাই। 'মনে মনে রাখিলেই হইল, ব্যাবহারিক জগতে অদ্বৈতভাব লইয়া আসা যায় না!' – আপনাদের চরিত্রের এই কলঙ্ক মুছিয়া ফেলুন। উঠুন, জাগুন; এই ক্ষুদ্র জীবন যদি যায়, ক্ষতি কি? সকলেই মরিবে – সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র – সকলেই মরিবে। শরীর কহারও চিরকাল থাকিবে না। অতএব উঠুন, জাগুন এবং সম্পূর্ণ অকপট হউন। ভারতে ঘোর কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। চাই চরিত্র, চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল, যাহাতে মানুষ একটা ভাবকে মরণকামড়ে ধরিয়া থাকিতে পারে।

'নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা সুখ্যাতিই করুন, লক্ষী আসুন বা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা শতাব্দান্তে হউক, তিনিই ধীর, যিনি ন্যায়পথ হইতে এক পাও বিচলত না হন।'.[২৫] উঠুন, জাগুন, সময় চলিয়া যাইতেছে, আর আমাদের সমুদয় শক্তি বৃথা বাক্যে ক্ষয় হইতেছে। উঠুন, জাগুন – সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত-মতান্তর লইয়া বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ করুন। আপনাদের সম্মুখে খুব বড় কাজ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমশঃ ডুবিতেছে, তাহদিগকে উদ্ধার করুন।

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখানকার অপেক্ষা কত বেশী হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না। হিন্দুজাতির লোপের সঙ্গে সঙ্গেই – তাহাদের শতদোষ সত্ত্বেও, পৃথিবীর সম্মুখে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থিত হইলেও এখনও তাহারা যে-সকল মহৎ ভাবের প্রতিনিধিরূপে বর্তমান, সেগুলিও লুপ্ত হইবে। আর হিন্দুদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল অধ্যাত্মজ্ঞানের চূড়ামণি অপূর্ব অদ্বৈততত্ত্বও বিলুপ্ত হইবে। অতএব উঠুন, জাগুন – পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করুন। আর প্রথমে আপনাদের স্বদেশের কল্যাণের জন্য এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত করুন। ব্যাবহারিক জগতে অদ্বৈতবাদ একটু কাজে পরিণত করা আমাদের যত প্রয়োজন, আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন ততটা নয়; প্রথমে অন্নের ব্যাবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম। গরীব লোকেরা অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্মোপদেশ দিতেছি! মত-মতান্তরে তো আর পেট ভরে না! আমাদের একটি দোষ বড়ই প্রবল – প্রথমতঃ আমাদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়তঃ ঘৃণা – হৃদয়ের শুষ্কতা। লক্ষ লক্ষ মতবাদের কথা বলিতে পারেন, কোটি কোটি সম্প্রদায় গঠন করিতে পারেন, কিন্তু যতদিন না জানিতেছেন যে, তাহারা আপনার শরীরের অংশ, যতদিন না আপনারা ও তাহারা, দরিদ্র-ধনী, সাধু-অসাধু সকলেই সেই অনন্ত অখণ্ডরূপ – যাঁহাকে আপনারা ব্রহ্ম বলেন, তাঁহার অংশ হইয়া যাইতেছেন, ততদিন কিছু হইবে না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের নিকট অদ্বৈতবাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন উহাকে কাজে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছি – শুধু এ-দেশে নয়, সর্বত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের লৌহমুদগরাঘাতে দ্বৈতবাদাত্মক ধর্মগুলির কাচনির্মিত ভিত্তিসমূহ সর্বত্র চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শুধু এখানেই যে দ্বৈতবাদীরা টানিয়া শাস্ত্রীয় শ্লোকের অর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে; – এতদূর টানা হইতেছে যে, আর চলে না, শ্লোকগুলি তো আর রবার নহে! – শুধু এদেশেই যে উহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্ধকারে কোণে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছ, তাহা নহে, ইওরোপ আমেরিকায় এই চেষ্টা আরও বেশী। আর সেখানেও ভারত হইতে এই তত্বের অন্ততঃ কিছু অংশ প্রবেশ করা চাই। ইতিপূর্বেই কিছু গিয়াছে – উহার প্রসার দিন দিন আরও বাড়াইতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য উহা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ পাশ্চাত্যদেশে সেখানকার প্রাচীন ভাবাদর্শ লোপ পাইতেছে, এক নূতন ব্যাবস্থা – কাঞ্চনের পূজা চালু হইতেছে। এই আধুনিক ধর্ম অর্থাৎ পরস্পর প্রতিযোগিতা ও কাঞ্চনপূজা অপেক্ষা যে সেই প্রাচীন অপরিণত ধর্মপ্রণালী ছিল ভাল। কোন জাতি যতই প্রবল হউক, এরূপ ভিত্তির উপর কখনই দাঁড়াইতে পারে না। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে বলিতেছে, যাহারাই এইরূপ ভিত্তির উপর তাহাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছে, তাহাদেরই বিনাশ হইয়াছে। যাহাতে ভারতে এই কাঞ্চনপূজার তরঙ্গ প্রবেশ না করে, সেদিকে প্রথমেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতএব সকলের নিকট এই অদ্বৈতবাদ প্রচার করুন, যাহাতে ধর্ম – আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবল আঘাতেও অক্ষত থাকিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, অপরকেও আপনাদের সাহায্য করিতে হইবে, আপনাদের ভাবরাশি ইওরোপ-আমেরিকাকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু সর্বাগ্রে আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এখানেই প্রকৃত কাজ রহিয়াছে, আর সেই কাজের প্রথমাংশ – দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর দারিদ্রে ও অজ্ঞান তিমিরে মজ্জমান ভারতের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের

.[২৫] নীতিশতকম্–ভর্তৃহরি

উন্নতিসাধন। তাহাদের কল্যাণের জন্য, তাহাদের সহায়তার জন্য বাহু প্রসারিত করুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী স্মরণ করুন:

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ গীতা: (৫।১৯)

–যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা ইহজীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

*****সমাপ্ত*****